ফুলের মালা।

শ্রীস্বর্ণকুমারী দেবী প্রণীত।

মাঘ। ১৩০১।

মূল্য ১৷০ আনা।

কলিকাতা,

অপার সারকুলার রোড, কাশিয়া বাগান বাগানবাটীতে

"ভারতী যন্ত্রে"

শ্রীতারিণীচরণ বিশ্বাস দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শক্তি নিরূপমার নিকট হইতে এরূপ অপ্রত্যাশিত উত্তর পাইয়া হৃতমর্য্যাদা রাণীর ন্যায় ভূমিতে চরণ তাড়না করিয়া সুতীব্র স্বরে বলিয়া উঠিল, "যাবিনে?"

"না-আ-আ"!

"যাবিনে? আয় বল্‌ছি!" বলিয়া শক্তি তাহার হাত ধরিয়া হিড় হিড় করিয়া টানিয়া লইয়া চলিল। বালিকা নিরাশার বলে বলীয়ান হইয়া "না যাব না" বলিয়া চীৎকার করিতে করিতে হাত ছাড়াইবার চেষ্টা করিতে লাগিল। এই সময় তরুশাখার মধ্য দিয়া আর দুইটি বালিকা সহসা দৈবসহায়রূপে প্রকাশিত হইয়া বলিয়া উঠিল, "শক্তি, ওকে কোথায় টেনে নিয়ে যাচ্ছিস্?—কি হয়েছে?" বলিতে বলিতে তাহারা শক্তি ও নিরূপমার নিকটবর্ত্তী হইয়া দাঁড়াইল। শক্তি তখন তাহার হাত ছাড়িয়া বলিল, "দেখ না! বল্‌ছি জলে চল, পদ্ম তুলে আনি, তা যাবে না।" করুণ নয়নে সখিদ্বয়ের মুখের দিকে চাহিয়া নিরূপমা বলিল, "আমি পলে যা'ব।" শক্তি মুখভঙ্গী করিয়া বলিল, "কচি খুকি আর কি! 'প'লে যাব'—!" কুসুম বলিল, "ও ছেলে মানুষ, ও থাক্। আচ্ছা চল আমি তোর সঙ্গে পদ্ম তুলতে যাচ্চি।"

কুসুম ও শক্তি জলে নামিল, কামিনী নিরূপমার চোক মুছাইয়া বলিল, "বকুল ফুল পড়েছে, আমরা আয় কুড়োইগে"। চোকের জল না শুকাইতে শুকাইতেই বালিকার অধরে হাসি ফুটিল, সে বাম হস্তের মুষ্টি খুলিয়া সঙ্গিনীকে দেখাইয়া সহর্ষে বলিল, "এই দেখ, আমি সুত এনেছি, মালা গেঁথে লাজকুমারকে দেব"।

ফাল্গুন মাস। নব বসন্তের হিল্লোলে বৃক্ষ পত্র মর্ম্মর করিতেছে, প্রস্ফুটিত আম্র মুকুলের সুগন্ধে চতুর্দ্দিক আমোদিত হইয়া

উঠিয়াছে। কোকিল, পাপিয়া দিগন্ত ছাপিয়া ঝঙ্কার তুলিয়াছে। সেই মলয়-হিল্লোলিত বসন্তপক্ষীকুজনিত পরিমলাকুল কাননতল ঢুঁরিয়া ঢুঁরিয়া সদ্যপতিত নব বকুলাবলীতে অঞ্চল ভরিয়া বালিকা দুইটি দীঘির ধারে আসিয়া বসিল, বসিয়া মালা গাঁথিতে আরম্ভ করিল। তখনও বেলা অবসান হয় নাই, পশ্চিমদিকে দীঘির জলে তরু-শ্রেণীর ঘন কাল ছায়ার উপর সূর্য্যকিরণ ঝক্‌মক্ করিতেছিল, আর পূর্ব্বদিকে পদ্মপত্রাচ্ছন্ন জলরাশির হৃদয় আলোড়িত এবং আলোকিত করিয়া দুইটি বালিকা সাঁতার দিয়া পদ্ম তুলিতেছিল। প্রস্ফুটিত শতদলরাজির মধ্যে প্রস্ফুটিত সুন্দর বালিকানন—উভয়ের মাধুর্য্যে উভয়ের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিতেছিল।

কামিনী একবার করিয়া তাহাদের দিকে চাহিতেছিল, একবার করিয়া হাতের দিকে চাহিয়া স্‌ঁচের মধ্যে ফুল পরাইতেছিল, কিন্তু নিরূপমা এক মনে মালা গাঁথিতেছিল। খানিক পরে শক্তি ও কুসুম আর্দ্রবসনে, আর্দ্র এলায়িত কেশে, স্নাতসুন্দর দিব্যরূপে তাহাদের নিকট আসিয়া অঞ্চলের শতদলরাশি ভূমির উপর ফেলিল। নিরূপমা সাগ্রহে বলিয়া উঠিল, "আমি একটা নেব, লাজকুমারকে দেব!"

শক্তি রাগিয়া বলিল, "ঈস্! আমরা তুল্‌ব, আর উনি 'লাজকুমারকে' দেবেন—আহ্লাদ দেখ একবার! কক্ষণো পাবিনে—যা।" নিরূপমার মুখটি চূণ হইয়া গেল। কামিনী বলিল, "তা, ভাই, তোরা এত ফুল তুল্লি, রাণীমার কিন্তু কাল পূজোর ফুল কম পড়বে—তখন দেখবি কি হয়।" শক্তি বলিল, "তা কে জানবে যে কে তুলেছে।" কুসুম বলিল, "আচ্ছা, ভাই! সত্যি কি একশ ফুলে শিব পূজো করলে সোয়ামী বশ হয়?"

কুসুম কামিনী দুজনেই বিবাহিত, কিন্তু বয়সে এখনও তাহারা

নিতান্ত বালিকা। একজন একাদশ একজন দ্বাদশ। কামিনী বলিল, "মা বলে, আগে নাকি রাজা রাণীকে দেখ্‌তে পার্‌ত না, একশ ফুলে শিব পূজো করে এখন মুটোর মধ্যে এনেছে। তা তোর দিদিকে নাকি তার সোয়ামী হেথায় রাখ্‌তে চায় না? তা সে পূজো করে না কেন? তাহলে ত সোয়ামী কথা শুন্‌বে!"

কুসুম বলিল, "তা, ভাই, ১০০শ ফুল রোজ আমরা কোথায় পাব! মা কিন্তু বলছিল তা নয়; রাজকুমারের কি ফাঁড়া আছে, তাই রাণীমা পূজো করে। সেই ফাঁড়ার জন্যে রাজকুমারের এখনো বে হয় নি। ফাল্গুন মাসটা গেলে তবে ফাঁড়া যাবে।"

কুসুম আহ্লাদে বলিয়া উঠিল, "আমাদের নতুন রাণী হলে কি মজাই হবে! আচ্ছা, বল দেখি, আমাদের রাণী কেমন হবে?" কামিনী বলিল, "আমাদের নিরূপমার মত রাণীটি হলে বেশ হয়—না?"

নিরূপমার চোখদুটি সহসা জ্বলিয়া উঠিল, হাতের মালা খসিয়া পড়িল। সে আগ্রহে বলিয়া উঠিল, "হ্যাঁ, দিদি, আমি রাণী হব—" কামিনী হাসিয়া তাহার মুখচুম্বন করিয়া বলিল, "আচ্ছা তুই রাণী হবি, আমরা আয় 'রাজা রাণী' খেলি। তুই রাণী, আমি রাণীমা, কুসুম সখী, শক্তি—"

তাহার কথা শেষ করিতে না দিয়াই শক্তি রুদ্ধশ্বাসে বলিল, "আর আমি?"

কু। তুই দাসী!

অমনি তাহার নীল আঁখি-তারার মধ্য দিয়া সহসা অগ্নিকণা নির্গত হইল। সে দৃঢ়তা-ব্যঞ্জক স্বরে বলিল "তা বই কি! আমি রাণী, নিরূপমা দাসী!"

নিরুপমা বলিতে যাইতেছিল "না, আমি দাসী হব না"—
এমন সময় বাঁশিতে গান বাজিল—

আমি কি করি,
বল্ সহচরি?
আমার প্রাণে উঠ্ছে গানের তুফান,
আমি গাহিতে নারি!
আমার মনের বাসনা,
সে রূপের নাইক তুলনা,
যে রূপে পাগল হৃদয় মন,
মুগ্ধ ত্রিভুবন,—
মনের সাধে দিনে রাতে,
সে রূপের স্তুতি গান করি!
গাহিব কি, বিন্দে সখি,
আমার বাঁশরী অরি!
আমি চাই,
বাঁশির তানে তাহার প্রাণে করুণা জাগাই;
'রাই গো শরণ দাও'—বলে
সে চরণের তলে পরাণ বিকাই।
বাঁশি আমারে ছলে!
বাজাতে গেলে
আর কিছু না বলে,
শুধু রাধানামে সাধা সুরে
ডাকে "কিশোরী!"
আমি উপায় কি করি?

নিরূপমা আহ্লাদে বলিয়া উঠিল, "ঐ লাজকুমার"!

কুসুম বলিল, "আচ্ছা রাজকুমার যাকে বলবেন সেই রাণী।"

কামিনী বলিল, "সেই ভাল"।

দেখিতে দেখিতে বাঁশরীধ্বনি থামিয়া গেল—চতুর্দ্দশ বৎসরের সুরূপ সুন্দর একটি বালক সেইখানে আসিয়া দাঁড়াইল। কুসুম সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিল "রাজকুমার, আচ্ছা তুমি বল কে রাণী? শক্তি না নিরূপমা?"

কামিনী বলিল, "আমরা রাজারাণী খেলছি। আমি রাণীমা—দিদি সখি, আর নিরূপমা—"

কুসুম। না, রাজকুমার! তুমি বল, কে রাণী?

রাজকুমার। কার রাণী?—রাজা কে?

দুজনে হাসিয়া বলিল, "সে আবার কে? এই তুমি রাজা!"

রাজকুমার হাসিয়া বলিলেন, "আমি রাজা! আর কে রাণী?"

নিরূপমা এতক্ষণ ধরিয়া যে ফুলের মালা গাঁথিয়া ফেলিয়া রাখিয়াছিল, রাজকুমার তাহা উঠাইয়া শক্তির গলায় দিয়া বলিলেন, "এই দেখ!"

গর্ব্বময় আহ্লাদ-জ্যোতিতে শক্তির বালিকা-মুখে যুবতীর গাম্ভীর্য্য ঘনীভূত হইল। নিরূপমার চক্ষু দুটি জলে ভরিয়া আসিল। কুসুম কামিনী হাসিয়া দু'জনকে একত্র করিয়া হুলু দিয়া বরণ করিল। পাপিয়া ডাঁজে ডাঁজে তাহার প্রতিধ্বনি গাহিয়া উঠিল। নিরূপমা যখন দেখিল তাহাদের বিবাহ হইয়া গেল, সে রাণী নহে শক্তিই রাণী, তখন সাশ্রুনয়নে রাজকুমারের নিকট আসিয়া কহিল—"আচ্ছা, আমি তবে লাজকুমারের দাসী!"

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

চতুর্দ্দশ শতাব্দীর মধ্যভাগে বঙ্গদেশ প্রকৃত প্রস্তাবে দিল্লীর অধীনতা ছিন্ন করিল। সুবর্ণগ্রামের শাসনকর্ত্তা বহরম খাঁর মৃত্যু হইলে ১৩৩৮ খৃষ্টাব্দে তদনুচর ফকীরুদ্দীন পূর্ব্ববাঙ্গালায় স্বাধীন পতাকা উড্ডীন করিলেন, আর লক্ষণাবতীর শাসনকর্ত্তা কদর খাঁকে নিহত করিয়া আলিউদ্দীন আলি সাহ পশ্চিম বাঙ্গালার অধিপতি হইয়া গৌড় সন্নিহিত পাণ্ডুয়ায় রাজধানী স্থাপিত করিলেন। অতঃপর আলি উদ্দীনের ধাত্রী-পুত্র সামসুদ্দিন ইলিয়াস সাহ শেষোক্ত রাজ্য কবলিত করিয়া ১৩৫২ খৃষ্টাব্দে সুবর্ণগ্রাম বিজয় করতঃ সমগ্র বাঙ্গালা একাধিপত্যে আনয়ন করিলেন! সম্রাট ফিরোজ সাহ তখন দিল্লীর সম্রাট। তিনি ইহাতে প্রমাদ গণিয়া সসৈন্যে বঙ্গে আগত হইলেন। পাণ্ডুয়া আক্রান্ত হইল। বঙ্গেশ্বর রাজধানী হইতে ১১শ ক্রোশ দূরে একদলা নামক দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন! সম্রাট উক্ত দুর্গ অবরোধ করিয়া যখন দেখিলেন সহজে উহা হস্তগত হইবার নহে, তখন সন্ধি স্থাপন করিয়া স্বদেশে ফিরিয়া গেলেন, এবং কয়েক বৎসর পরে ১৩৫৭ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গালার স্বাধীনতা স্বীকারে বাধ্য হইলেন। বঙ্গেশ্বর পূর্ণমনোরথ হইয়া মহোৎসবে সুলতান উপাধি গ্রহণ করিলেন। সেই বিজয় আনন্দ দিনের স্মরণার্থ সেই অবধি প্রতি বৎসর রাজধানীতে একটি করিয়া উৎসব হইয়া থাকে। শস্ত্র ক্রীড়াই এই উৎসবের প্রধান আমোদ। অস্ত্রযুদ্ধে, ব্যায়ামযুদ্ধে যিনি সে দিবস জয় লাভ করেন, বঙ্গেশ্বর তাঁহাকে সম্মানিত করিয়া পুরস্কার প্রদান করেন।

রাজধানীতে আজ অস্ত্রোৎসব। চন্দ্রাতপাবরিত সুসজ্জিত দুর্গ-প্রান্তর লোকে পরিপূর্ণ। বঙ্গেশ্বর আলিয়াস সাহ্ এখন জীবিত নাই, তৎপুত্র সুলতান সেকন্দর সাহ উচ্চ মঞ্চোপরি ফুলময় স্তম্ভবেষ্টিত একটি মণ্ডল মধ্যে সর্ব্বোচ্চ সিংহাসনে বসিয়া আছেন। চতুষ্পার্শ্বে বঙ্গের নানা স্থান হইতে সমাগত নিমন্ত্রিত রাজা, জমিদার, সামন্তবর্গ, এবং সভাসদ্‌গণ পদমর্য্যাদা অনুসারে উপবিষ্ট। অদূরে মল্লযুদ্ধের চীৎকার, তরবারি-যুদ্ধের ঝন্‌ঝনা, দর্শকবৃন্দের সোৎসুক উল্লাসধ্বনি, প্রান্তর কাঁপাইয়া তুলিয়াছে।

দুর্গের চতুর্দ্দিকে নানারূপ সুশোভিত বিপণি। কোথাও খাদ্যের রাশি, কোথাও ফুলের বাহার, কোথাও চারু শিল্প-সৌন্দর্য্য, কোথাও অস্ত্রের চাক্‌চিক্য। অনেক রকমের ব্যবসাদারই আজ লাভের আশায় দুর্গে জড় হইয়াছে, অদৃষ্টের ব্যবসাদারই বা এ সুযোগ ছাড়িবে কেন? তাহারাও দোকানপাট সাজাইয়া বসিয়াছে, অনেকে তাহাদের কাছে গিয়া ঘরের পয়সা দিয়া দুঃখ কিনিয়া লইয়া গৃহে যাইতেছেন।

এইরূপ একটি দোকানে কিছু বিশেষ ভিড়। নামের জোরে ক্রেতার উপর ক্রেতা আসিয়া জুটিতেছে, বিক্রেতা একা তাহাদিগের সকলের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করিয়া উঠিতে পারিতেছেন না। তাঁহার প্রাণ ওষ্ঠাগত হইয়া উঠিয়াছে, তিনি লাভের চরণে গড় করিয়া পলায়নের উদ্যোগ করিতেছেন, এমন সময় সহসা একটি সুন্দরী আসিয়া তাঁহার হাতটি দেখিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। সৌন্দর্য্যের অনুরোধ বড় অনুরোধ! গণকঠাকুর তাহা অগ্রাহ্য করিতে পারিলেন না, সুন্দরীর বাম হাতটি হাতে ধরিয়া এক দৃষ্টে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া সেই

রাজরাণীযোগ্য পৃথিবী-বিপ্লবকারী রূপরাশি দেখিতে লাগিলেন। তাঁহার ভাব দেখিয়া একজন দর্শক বলিয়া উঠিল, "ঠাকুর! মুখে কি গণা যায়, হাত দেখুন।" আর একজন বলিল, "গণকঠাকুর কি তেমনি পাত্র হাতে কিছু না পেলে কি হাত দেখবেন!" বালিকা গণকের হস্তে কিঞ্চিৎ অর্থ দিতে গেলেন—তিনি অস্বীকার করিয়া বলিলেন, "মা, তুমি রাজরাজেশ্বরী হইবে, তোমার কাছে কিছু নেব না।" একজন অশ্বারোহী এই জনতার নিকট দিয়া ধীরে ধীরে যাইতেছিলেন, বালিকার পার্শ্ববর্ত্তী হইবামাত্র তাহার প্রতি দৃষ্টি পড়ায় সহসা বিস্মিতনেত্রে সেইখানে অশ্ব থামাইলেন। সুন্দরী তাঁহার সম্পূর্ণ অপরিচিত; সেই নয়নঝলসিতকারী রূপ তিনি আর কখনও ইতিপূর্ব্বে দেখেন নাই। অথচ পূর্ব্ব জন্মের বিস্মৃত স্মৃতির মত সে রূপ যেন চেনা চেনা বলিয়া মনে হইতে লাগিল। তিনি মুগ্ধ আত্মবিস্মৃত হইয়া চিত্রার্পিতের ন্যায় তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন, জনতা তাঁহা হইতে দূরে চলিয়া গেল। কি স্মৃতিসূত্রে কে জানে সেই অপরিচিত সুন্দরীর মুখের দিকে চাহিয়া তিনি আর সমস্ত ভুলিয়া গেলেন, কেবল একটি দূর শৈশব ঘটনা তাঁহার মনে জাগিয়া উঠিল। বিজন দীঘির ধার, নিস্তব্ধ উপবন, তাঁহার হাতে হাত সংযুক্ত, সিক্ত-এলায়িত-কেশ, আর্দ্র বসন বালিকার দিব্য মূর্ত্তি, আর সহচরীদিগের সোল্লাস হুলুধনি, তাঁহার মনে পড়িতে লাগিল। সহসা অশ্ব অধীরভাবে গ্রীবা উত্তোলন করিল, রাজকুমারের চমক ভঙ্গ হইল; লক্ষ্য ভেদ করিবার জন্য নকীব তীরযোদ্ধাগণকে আহ্বান করিতেছে শুনিতে পাইলেন। অশ্বারোহী আত্মস্থ হইয়া নিজের মুগ্ধতায় মনে মনে হাসিয়া সেইদিকে অশ্বচালনা করিয়া দিলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

কৃপাণযুদ্ধ বর্ষাযুদ্ধ প্রভৃতি অন্যান্য অস্ত্র খেলা হইয়া গিয়াছে, কেবল মাত্র তীর খেলাই এখনও বাকী রহিয়াছে। অদূরে অশ্ব প্রস্তুত, সুলতান সেকন্দর সাহ সিংহাসন হইতে নামিয়া অশ্বারোহণ করিলেন, আর সভাসদ্‌ ও নিমন্ত্রিতগণ তাঁহার উভয় পার্শ্বে এবং পশ্চাতে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া দণ্ডায়মান হইল। একটি হস্তাবস্থিত পক্ষীমুখচুম্বনকারী প্রস্তরময়ী রমণীমূর্ত্তি দূরে সম্মুখে স্থাপিত, সেই পক্ষীর চক্ষুর প্রতি তীর সন্ধান করিয়া বিদ্ধ করিতে হইবে। পক্ষীটি রমণীর কপোলে এমনি ভাবে অবস্থিত যে রমণীমূর্ত্তিকে কিছুমাত্র আঘাত না করিয়া তীর দ্বারা কেবল চক্ষু বিদ্ধ করা বিশেষ পারদর্শিতার কার্য্য। সমস্ত দিন যে সকল খেলা হইয়াছে তাহার মধ্যে এইটি দেখিবার জন্য সকলে সমুৎসুক। বঙ্গেশ্বরের ইঙ্গিতে নকীব একটু অগ্রসর হইয়া চীৎকার করিয়া বলিল, "এই লক্ষ্য ভেদ করিয়া যিনি সম্মানিত হইতে চাহেন, সুলতান সেকন্দর সাহের অনুজ্ঞায় তিনি এইবার সম্মুখীন হউন।" নকীব উচ্চৈঃস্বরে তিন বার এই কথা বলিল। হ্রেসারব করিয়া সতেজে গ্রীবা উত্তোলন পূর্ব্বক সুন্দর যুবাপুরুষকে পৃষ্ঠে বহন করিয়া এক তেজস্বী অশ্ব অগ্রসর হইল। সহসা প্রান্তরের ভীষণ কোলাহল নিস্তব্ধতায় পরিণত হইল, মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় বদ্ধদৃষ্টি হইয়া সকলে রুদ্ধ নিশ্বাসে দাঁড়াইয়া রহিল। যুবক রাজার দিকে অগ্রসর হইতে হইতে

রাজাকে তিন বার অভিবাদন পূর্ব্বক প্রস্তর-মূর্ত্তিকে লক্ষ্য করিয়া তীর ছুঁড়িলেন, অমনি ঘোরতর কোলাহল উত্থিত হইল। চতুর্দ্দিক হইতে লোক আসিয়া প্রস্তরমূর্ত্তি বেষ্টন করিয়া ফেলিল, দেখিল পক্ষীচক্ষু বিদ্ধ করিয়া তীর চলিয়া গিয়াছে! আকাশ-প্রান্তর প্রতিধ্বনিত করিয়া অমনি জয়ধ্বনি উঠিল, দিনাজপুরের রাজকুমার গণেশদেব লক্ষ্যভেদ করিয়াছেন। দর্শকবৃন্দের উল্লাস-ধ্বনির মধ্য দিয়া, সভাসদ্‌গণের পুষ্পবৃষ্টির মধ্য দিয়া, রাজকুমার পদব্রজে বঙ্গেশ্বরের সমীপে আনীত হইলেন। সুলতান সাহও অশ্ব হইতে নামিলেন। তিনি স্বহস্তে যুবকের কটিদেশে একখানি বহুমূল্য তরবারি বাঁধিয়া রায়বাহাদুর উপাধি প্রদান করিলেন। চারিদিক হইতে আবার উৎসাহের জয়ধ্বনি উঠিল, সহস্র পুষ্পমালা তাঁহার কণ্ঠদেশে অর্পিত হইতে লাগিল। একজন রমণী দূর হইতে রাজকুমারের লক্ষ্যভেদ দেখিতেছিল, সে এই সময় কণ্ঠদেশ হইতে একগাছি শুষ্ক ফুলমালা উন্মোচন করিয়া তাহা একটি ক্ষুদ্র প্রস্তরখণ্ডে জড়াইয়া রাজকুমারের উদ্দেশে ছুঁড়িয়া দিল; কিন্তু মালা লক্ষ্যস্থানে না পৌঁছিয়া সুলতানের গাত্রে লাগিয়া নিম্নে পতিত হইল। বঙ্গেশ্বর তরবারি বাঁধিতে বাঁধিতে স্খলিতহস্ত হইয়া বিস্ময়ে এবং বিরক্ত দৃষ্টিতে নতমুখ উন্নত করিলেন। নিকটস্থ সভাসদ্‌গণ ফুলবর্ষণে ক্ষান্ত হইয়া সভয়ে তাঁহার দিকে চাহিল, সুলতান সাহের পুত্র নবাব গায়সুদ্দিন সেই শুষ্কমালাগাছি ভূমিতল হইতে লইয়া যখন হাসিয়া বলিলেন, "রাজকুমার, শুষ্ক ফুলের মালায় কে তোমাকে অভিবাদন করিল?" তখন সকলেরই গাম্ভীর্য্য দূর হইল, বঙ্গেশ্বর সহাস্য মুখে গণেশদেবের কটিতে আবার তরবারি বাঁধিতে লাগিলেন। আবার জয়ধ্বনি, ফুলবৃষ্টি হইতে লাগিল! এমন সময় জনতার মধ্য দিয়া একজন

দৃঢ়পদক্ষেপে যুবরাজ গায়সুদ্দিনের নিকটে আসিয়া অভিবাদন করিয়া বলিল, "আমার ফুলের মালা আমাকে ফিরাইয়া দিতে আজ্ঞা হউক"। সকলে বিস্ময় দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া রহিল। যুবরাজ তাহার মালা তাহাকে ফিরাইয়া দিলেন। সে মালা-হস্তে গণেশদেবের দিকে চাহিয়া একটু থমকিয়া দাঁড়াইল, তাহার পর সুলতান সাহ এবং তাঁহার পুত্রকে অভিবাদন করিয়া যেমন দৃঢ় পদক্ষেপে আসিয়াছিল সেইরূপ নির্ভয় দৃঢ় পদক্ষেপে আবার চলিয়া গেল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

সূর্য্য পশ্চিম প্রান্তে ঢলিয়া পড়িয়াছে, তাহার হেমাভ রশ্মিগুলি নদীর উর্ম্মিলস্রোত চমকিয়া পরপারের বৃক্ষ শিখরে খেলিতে খেলিতে ক্রমে সরিয়া যাইতেছে। কুমার গণেশদেব অশ্বারোহণে তীর পথ দিয়া এই সময় ধীরে ধীরে বাসস্থানাভিমুখে ফিরিতে ছিলেন। কিন্তু অপরাহ্নের দৃশ্যশোভায় কুমার মুগ্ধ নহেন, কিম্বা মধ্যাহ্নের বিজয় সম্মানের কথাও এখন তাঁহার মনে নাই, তিনি কেবল ভাবিতেছেন সেই দীনবেশা যুবতীর কথা। তাহার জ্যোতির্ম্ময়ী আভ্যন্তরী সৌন্দর্য্য, তাঁহার ন্যায় অপরিচিতের প্রতি সেই পরিচিত সহাস-দৃষ্টি, রাজসভায় শুষ্ক ফুলমালা নিক্ষেপ, এবং তাহা ফিরাইয়া লইয়া যাওয়া—এই সকল রহস্যময় চিন্তাতেই তিনি অনন্যমন। অপরিচিতার সম্বন্ধে সমস্তই অপরূপ, বিস্ময়-

জনক প্রহেলিকা! তাহার বেশভূষা, ব্যবহার, ভাবভঙ্গী, এমন কি, একটি কটাক্ষ, প্রত্যেক পদক্ষেপ পর্য্যন্ত। তাহার পরিধানে গেরুয়া বসন অথচ সে সন্ন্যাসিনী নহে। কেননা সন্ন্যাসিনীর ত্রিশূল জটাজুট বিভূতি রুদ্রাক্ষমালা তাহার নাই, মস্তক অনাবরিত নহে; গেরুয়া বর্ণের সূক্ষ্ম ওড়নার মধ্য দিয়া গ্রীবাদেশের অযত্ন-বদ্ধ অর্দ্ধমুক্ত লোল কবরী লক্ষিত হইতেছে। সম্মুখে অর্দ্ধোন্মুক্ত মস্তকে তরঙ্গায়িত সুচিক্কণ কেশশোভা, দু-একটী কুঞ্চিত শিথিল অলকদাম ভালে, কপোলে খসিয়া পড়িয়া তাহার কমলাননের কমনীয় কান্তি অতি মধুররূপে ফুটাইয়া তুলিয়াছে।

"সুন্দরী কি কোন বিধবা তীর্থযাত্রী? কিন্তু বিধবা যদি হয় তবে হাতে দুগাছি স্বর্ণবলয় কেন? হয়ত বালবিধবা বলিয়া পিতা মাতা তাহাকে অলঙ্কারহীন করেন নাই। তাহাই সম্ভব; কেন না সধবারমণী হইলে পরিব্রাজিকা হইয়া বেড়াইবে কেন।" সুন্দরী যে কুমারীও হইতে পারে, এ সম্ভাবনা পর্য্যন্ত কুমারের মনে উদয় হইল না। ওরূপ যৌবনপ্রাপ্তা হিন্দুকন্যা যে অবিবাহিত থাকিবে, এ কথা সহসা কাহার মনে আসে! রাজকুমার অনুমান করিলেন, "তাহাই ঠিক, সুন্দরী তীর্থযাত্রী বিধবা, এবং উচ্চ-বংশীয়া পুরবালা তাহাতেও সন্দেহ নাই। তাহার প্রতি পদক্ষেপে আত্মমর্য্যাদা, প্রত্যেক কটাক্ষে সাধ্বীর তেজগর্ব্ব প্রকাশিত! অথচ তাঁহার প্রতি যখনি সে চাহিয়াছে সে দৃষ্টিতে অতি মধুর প্রেমময় পরিচিত ভাব প্রকাশ পাইয়াছে কেন? তিনি তাহাকে কখনও দেখেন নাই, চেনেন না, তবে এ দৃষ্টির অর্থ কি? সুন্দরীর সকলি রহস্য! সকলি প্রহেলিকা!" এইরূপ চিন্তামগ্ন হইয়া লোলরাশ হস্তে রাজকুমার অল্পে অল্পে অগ্রসর হইতেছেন—

সহসা তাঁহার গতিরোধ হইল, আবার সেই বিস্ময়! সেই অপরিচিত সুন্দরীমূর্ত্তি তাঁহার দিকে হাস্যমুখে চাহিয়া ঐ বৃক্ষতলে দাঁড়াইয়া আছে!

রাজকুমারের স্বপ্ন বলিয়া মনে হইতে লাগিল। সমস্তদিন ধরিয়া তিনি কি কেবল স্বপ্ন দেখিতেছেন নাকি! কিন্তু অধিকক্ষণ ধরিয়া এই বিস্ময় ভোগ করিবার অবসর তাঁহার ঘটিল না। অশ্বকে থামিতে দেখিয়া রমণী নিকটে আগমন করিল, আসিয়া মৃদুহাসি হাসিয়া বলিল, "রাজকুমার, চিনতে পারছেন না বুঝি?"

রাজকুমারের কথা ফুটিল না! শক্তিময়ী আবার বলিল, "সেই দীঘির ধারের খেলা কি মনে পড়ে?"

রাজকুমার ধীরে ধীরে সুষুপ্তের মত বলিলেন, "বাল্যসখি শক্তিময়ি!"

শক্তি হাসিয়া বলিল, "তাও বুঝি মনে করিয়ে দিতে হয়! আমি ত দেখবামাত্রই চিনেচি।" একটা আবেগতরঙ্গ রাজকুমারের হৃদয় আলোড়িত করিয়া তুলিয়া সহসা আবার প্রশমিত হইয়া পড়িল। সেই তিনি, সেই শক্তি, অথচ মধ্যে এখন ভাবের অনন্ত ব্যবধান! সে দিন যে তাঁহার নিতান্ত আপনার ছিল, যাহার সহিত একদিন অসঙ্কোচে খেলা করিয়াছেন, গল্প করিয়াছেন, সে এখন বিবাহিতা যুবতী, তাঁহার বহু সম্মানীয়া পরস্ত্রী। একদিকে বালবন্ধুত্বের স্বাভাবিক উচ্ছ্বাস অন্য দিকে সংস্কারগত পরপুরুষোচিত সম্মান সঙ্কোচভাব যুগপৎ তাঁহাকে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় করিয়া তুলিল। এমন কি, তিনি যে শক্তিময়ীকে কিরূপে সম্ভাষণ করিবেন তাহাও ভাবিয়া পাইলেন না।

শক্তি যখন আবার অসঙ্কোচ আত্মীয়তার ভাবে বলিল—"বলি,

ঘোড়া থেকে একবার নামলে হয় না! সবাই তোমাকে বিজয় সম্মান দিয়েছে, আর আমার বাসী মালা বলে কি গলায় পরতে এতই অনিচ্ছা?”

রাজকুমার তখন তাঁহার সঙ্কোচ ভুলিয়া আত্মস্থ হইয়া হাসিয়া বলিলেন, “সেই শুকনো মালা গাছি বুঝি আমার সম্মানের জন্যই নিক্ষিপ্ত হয়েছিল?”

শক্তি বলিল, “অভিপ্রায়টা সেইরূপ ছিল বটে। কিন্তু মালা যে তোমার কাছে নাও পৌছতে পারে মনের আবেগে সে বুদ্ধিটুকু তখন যোগায়নি, লাভে হতে আমার মালার দলগুলি ছিঁড়ে গেছে।” রাজকুমার এই কথায় একটু হাসিয়া অশ্ব হইতে নামিতে নামিতে বলিলেন “শক্তি, শুকান মালার উপহার! এ কি সম্মান না উপহাস?” শক্তি সে কথার কোন উত্তর না করিয়া বলিল, “ঘোড়া নিয়ে আমার সঙ্গে এস, ঐ দিকে বসবার জায়গা আছে, সেই খানে ঘোড়া বেঁধো।”

শক্তি পথ দেখাইয়া চলিল। রাজকুমার ঘোড়ার বল্গা ধরিয়া তাহার সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

তীরদেশের ঘনসংলগ্ন বৃক্ষরাজিসঙ্কুল বনকুঞ্জতলে সদ্য-কুঠারছিন্ন যে তিন্তিড়ি তরু অর্দ্ধস্থল অর্দ্ধজল অধিকার করিয়া শুইয়া পড়িয়াছিল শক্তি সেইখানে আসিয়া তাহার উপর বসিল। রাজ-কুমার একটি তরুমূলে অশ্ব বাঁধিয়া শক্তির নিকটবর্ত্তী তরুশাখা ধরিয়া দাঁড়াইলেন। সূর্য্য অস্তে গিয়াছে, কিন্তু তখনও সন্ধ্যার ধূম্রবরণে পৃথিবী আচ্ছাদিত হয় নাই। পশ্চিম গগণে উজ্জ্বল লাল মেঘের স্তর জমিয়াছে, তাহার আভায় জলস্থল লাল হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু শক্তির সুরূপ সুন্দর মুখে তাহা যেমন শোভিত হইয়াছে এমন আর কোথাও নহে।

শক্তি গৌরী—কিন্তু সাধারণ বঙ্গবালার ন্যায় চম্পক বা কোমল পাণ্ডুবরণী নহে—তাহার বর্ণ ইরাণীর ন্যায় তেজোময়ী, প্রফুল্ল, প্রদীপ্ত, সুবর্ণাভ। কেবল বর্ণ নহে, তাহার সুঠাম সুদীর্ঘ নাসায়, বক্ররেখাযুক্ত নিমীলিতপ্রান্ত ওষ্ঠাধরে, মধ্যবিভক্ত ক্ষুদ্র চিবুকে, কৃষ্ণভ্রূধনু-নিম্নস্থ ঘনপত্রশালী নীলনয়নের দৃষ্টিতে আত্ম-গরিমাময় গর্ব্বিত দীপ্তসৌন্দর্য্য প্রকটিত। তাহার আননের এই তেজ, এই দীপ্তি ম্লানস্নিগ্ধ গৈরিক পরিচ্ছদে, কুঞ্চিত অলক গুচ্ছের সংস্পর্শে, নয়নের প্রেমময় আবেগচাঞ্চল্যে, এবং অধর-পুটের আনন্দবিস্ফুরিত ভাবে, আপাততঃ অতি মধুর কোমল কমনীয়তা লাভ করিয়াছিল। রাজকুমারের তাহাকে দেখিয়া শকুন্তলাকে মনে পড়িতেছিল, দুষ্মন্ত ঠিক বলিয়াছেন—

"সরসিজমনুবিদ্ধং শৈবলেনাপিরম্যং
মলিনমপি হিমাংশোর্লক্ষ্ম লক্ষ্মীং তনোতি।
ইয়মধিক মনোজ্ঞা বল্কলেনাপি তন্বী
কিমিবহি মধুরাণাং মণ্ডনাং আকৃতিনাং॥"

সেই রূপমাধুর্য্যে মুগ্ধ হইয়া ক্রমে তাঁহার সমস্তই ভুল হইয়া পড়িতে লাগিল। তাঁহার মনে হইতে লাগিল,—নদীকূলের এই বনানীতল যেন সরসীতটের সেই উপবন, আর তিনি যেন সেই চতুর্দ্দশবর্ষীয় বালক, শক্তি তাঁহার বালিকা সখী, তাঁহার রাণী। মোহপরায়ণ হইয়া তিনি যে কখন ধীরে ধীরে শক্তির পার্শ্বে পতিত বৃক্ষের উপর আসিয়া বসিলেন তাহা জানিতেও পারিলেন না। শক্তি যখন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল "রাজকুমার আগের মত এখনও বাঁশি বাজাও?" তখন তাঁহার চমক ভাঙ্গিল, ধীরে ধীরে একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া তিনি একটু দূরে সরিয়া বসিলেন, কিন্তু একেবারে আর উঠিয়া দাঁড়ান হইল না। শক্তি আবার বলিল, "রাজকুমার, তোমার বাঁশি কই? আগের মত আর বাঁশি বাজাও না?"

রাজকুমার দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "'আগের মত'? আগের দিন কি পরে থাকে? রাত পোহালেই যে স্বপ্ন ভাঙ্গে।"

শক্তি। কিন্তু আবার ত রাত আসে?

রাজ। ঠিক পূর্ব্বরাত্রের সে স্বপ্নটিত আর সঙ্গে নিয়ে আসে না।

রাজকুমারের কথায় শক্তির হৃদয় আনন্দস্ফীত হইল। রাধা বিহনেই যে বৃন্দাবন অন্ধকার, শ্যামের বাঁশরী বন্ধ তাহা বুঝিতে সে ভুল করিল না। কেনই বা করিবে, সে যেমন রাজকুমারের

বিরহযাতনা সহিয়াছে রাজকুমারও ত তাহার অদর্শনে সেইরূপ যাতনাই ভোগ করিবেন! বাল্যকালে যখন সংসারের বিষময় অভিজ্ঞতায় হৃদয় জর্জ্জরিত হয় নাই, তখন প্রেমে পূর্ণ বিশ্বাস। সে হাসিয়া বলিল, "তেমন সাধ থাকিলে পুরাণ স্বপ্ন কি আর ফেরে না! এর মধ্যে তোমার সব সাধ ফুরিয়েছে নাকি?" রাজকুমার হাসিয়া বলিলেন "সব না হোক কতকটা ত বটে। আর বুড় হতে চল্লুম, রাজ্যভার আমার হাতে, প্রজার সুখ দুঃখ দেখব না ছেলেবেলার মত কেবলি খেলা-ধূলা নিয়ে বাঁশি বাজিয়ে দিন কাটাব?"

রাজকুমার বিংশতি বৎসর অতিক্রম করিয়াছেন মাত্র। বালক স্বভাব-সুলভ ভাবে এখনও তাঁহার হৃদয় পরিপূর্ণ তাই তিনি কথায় কথায় আপনার বৃদ্ধত্ব প্রকাশ করিয়া সুখ অনুভব করেন। শক্তি বলিল, "তোমার যেন বাঁশি বাজাবার সাধ মিটেছে কিন্তু আমার ত আর শোনবার সাধ এখনও মেটে নি! ছি রাজকুমার! যে বাঁশি ছাড়া তুমি আগে একদণ্ড থাকতে পারতে না, এখন তাকে ছাড়লে কি করে? বরঞ্চ কন্দর্পকে তার ধনুর্ব্বাণ ছাড়া কল্পনা করা যায় বংশীধারী মদনমোহনকেও কেবল ধড়াচূড়াতে কল্পনা করা যায় কিন্তু আমাদের গণেশদেবকে বাঁশি ছাড়া মনে করতে হলে অন্তর বাহিরের সমস্তই যেন ওলট পালট হয়ে পড়ে!"

রাজকুমার হাসিয়া বলিলেন, "তা যদি তবে আর দেখছি বাঁশি ছাড়া হোল না"—বলিয়া তাঁহার রাজপরিচ্ছদের অভ্যন্তর হইতে ক্ষুদ্র দুইখণ্ড কাষ্ঠনল বাহির করিয়া জুড়িতে লাগিলেন। শক্তি আহ্লাদে বলিল, "সেই বাঁশের বাঁশি!

রাজ। হ্যাঁ, তোমার সেই বাঁশিটি।

বাজাইতে শিখিবে বলিয়া ছেলেবেলা শক্তি এই বাঁশিটি রাজকুমারের নিকট লইয়া আসিয়াছিল, কিন্তু দুদিন বাঁশিতে ফুঁ দিয়াই তাহার শিখিবার সাধ মিটিয়া গেল, লাভে হইতে বাঁশিটি রাজকুমার দখল করিয়া লইলেন। যদিও সামান্য বাঁশের বাঁশি, কিন্তু তাঁহার স্বর্ণমণ্ডিত বাঁশীর অপেক্ষা ইহা বাজে ভাল!

শক্তি বলিল, "এখন রাজা হয়েছ এখন এ সামান্য বাঁশের বাঁশি কি তোমার হাতে শোভা পায়, মহারাজ! আমার ইচ্ছা হচ্ছে তোমার ঐ খেলবার বাঁশিটি কেড়ে জলে ফেলে দিই! ছি রাজার হাতে ও যেন ঠাট্টা!"

রাজকুমার তাঁহার সদ্যোপহারপ্রাপ্ত মহামূল্য তরবারীতে হস্ত নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন, "শক্তি, এই বহুমূল্য তরবারির অপেক্ষা এই সামান্য বাঁশিটি আমার কাছে অধিক মূল্যবান! বরঞ্চ এই তরবারিখানি আমি জলে ফেলে দিতে পারি, কিন্তু এই বাঁশিটি নিজের দেহের মত অতি যত্নে রক্ষার সামগ্রী। পুরাতন স্মৃতির এইটুকু মাত্র 'আমার' বলে অবশিষ্ট আছে!"

রাজকুমারের কথায় শক্তির আরক্ত কপোল আরও আরক্তাভ হইয়া উঠিল। সে হাসিয়া মাথার কাপড় খুলিয়া কণ্ঠস্থিত ফুলের হারে হাত দিয়া বলিল, "রাজকুমার, তোমার যেমন বাঁশি, আমার তেমনি এই শুক্‌নো মালা! এটি তোমার হাতের উপহার। এর মত মহামূল্য জিনিষ আমার আর কিছু নেই, তাই এইটি দিয়েই তোমার জয়ের দিনে আহ্লাদ প্রকাশ করেছিলুম। এখন তুমিই বল, শুক্‌নো মালার এই উপহার, সম্মান না উপহাস?"

একটা বিদ্যুৎ-প্রবাহ রাজকুমারের হৃদয় কম্পিত করিয়া অবসিত হইল—তাহা সুখের কি দুঃখের তাহা তিনি অনুভব করিতে

পারিলেন না। কিন্তু মুহূর্ত্তমধ্যে তাঁহার প্রফুল্ল মুখ বিষণ্ণ হইয়া পড়িল। তিনি শক্তিকে ভুলিতে পারেন নাই সত্য—কিন্তু তাহাতে অন্যের ক্ষতি বৃদ্ধি নাই, যা কিছু ক্ষতি তাঁহার নিজেরই। তিনি পুরুষ, শত বিবাহও তাঁহার পক্ষে যখন শাস্ত্রসম্মত, তখন একাধিক রমণীর চিন্তাও তাঁহার পক্ষে সেরূপ দোষজনক নহে। বিশেষ শক্তি পরস্ত্রী হইবার পূর্ব্বে তাঁহার হৃদয় অধিকার করিয়াছে, সুতরাং যাহাতে তাঁহার স্মৃতিপূর্ণ সে এ শক্তি নহে, সে তাঁহার বাল্যসখী, কুমারী শক্তিময়ী। কিন্তু শক্তি যে রমণী হইয়া, অন্যের পত্নী হইয়া, এখনও তাঁহার স্মৃতি ধরিয়া আছে ইহাতে তাহার ইহকাল পরকাল উভয়েরই ক্ষতি!

কুমারের ম্লান দৃষ্টি, বিষণ্ণভাব, দেখিয়া শক্তি সহসা স্তম্ভিত হইয়া পড়িল, সে গলা হইতে মালা খুলিয়া রাজকুমারকে পরাইতে যাইতেছিল, হাতের মালা তাহার হাতেই রহিয়া গেল—আর পরাণ হইল না!

কুমার বলিলেন, "শক্তি, সেই খেলার মালা! সে খেলা এখনও ভোল নি? সে যে বালকের খেলা! তোমার ভুলে যাওয়া উচিত ছিল।"

শক্তি মর্ম্মাহত হইয়া বলিল, "তুমি ভুলেছ?"

কুমার। "ভুলি নি—কিন্তু ভোলা উচিত ছিল। শক্তি, তুমি কেন হঠাৎ দেশ থেকে চলে গেলে, তোমার যে কত খোঁজ করেছি তার আর ঠিক নেই!

রাজকুমার কঠোর কর্ত্তব্যযুক্তি প্রদান করিতে গিয়া নিজের অনুরাগই ব্যক্ত করিয়া ফেলিলেন। শক্তি ইহাতে মুহূর্ত্ত পূর্ব্বের আঘাত বেদনা ভুলিয়া আত্মস্থ হইয়া বলিল, "রাজকুমার, কেন যে

চলে এলুম তা জানি নে। একদিন সকালে বাবা বল্লেন, আমি তীর্থযাত্রায় যাব এখনি নৌকায় উঠতে হবে, এস আমার সঙ্গে।' আমি অনেক চেষ্টা করলুম, যদি রাজবাড়ীতে গিয়ে তোমাকে একবার বলে আসতে পারি—কিন্তু বাবা তার অবকাশ দিলেন না, তখনি তাঁর সঙ্গে নৌকায় উঠতে হল। এই ছ বছর তাঁর সঙ্গে সঙ্গে ঘুরছি। প্রতি দিন জিজ্ঞাসা করি, কবে বাড়ী ফিরব? তাঁর উত্তর, 'আগে তীর্থ করা সাঙ্গ হোক'। এ ক বছর যে কি কষ্টে দিন কেটেছে তা ভগবানই জানেন, এই শুকনো ফুলের মালা গাছটি,—"

তাহার কথা শেষ না হইতেই রাজকুমার বিস্ময়ে বলিলেন, "আমি মনে করেছিলুম তুমি বিবাহিত—তোমার এখনও বিবাহ হয় নি?"

সে হাসিয়া বলিল, "স্ত্রীলোকের কি কখনও দুবার বিবাহ হয় নাকি?" রাজকুমার মস্তক অবনত করিলেন, অনুতাপের তীব্র বৃশ্চিক দংশনের জ্বালায় তিনি জ্বলিয়া উঠিলেন। শক্তি তাহাকে স্বামী ভাবিয়া এতদিন কুমারী আছে, আর তিনি বিবাহ করিয়া সুখে স্বচ্ছন্দে দিনযাপন করিতেছেন! তবে এই অনুতাপের মধ্যেও তিনি যে কিছুমাত্র সুখ অনুভব করিলেন না এমন কথা বলা যায় না। অন্য যাহাই হউক শক্তি পরস্ত্রী নহে।

শক্তি জিজ্ঞাসা করিল, "রাজকুমারের অবশ্য বিবাহ হইয়াছে?" রাজকুমার ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া সাশ্রুনয়নে বলিলেন, "শক্তি, কেন তুমি চলে গেলে?"

শক্তি। তাই আর মনে ছিল না?"

কুমার। "তা নয়। মায়ের মুখে শুনলুম, বিবাহ দেবার

জন্যেই তোমার পিতা তোমাকে দেশে নিয়ে গেছেন। আমি মনে করলুম তুমি পরস্ত্রী।"

শক্তির পিতার বাড়ী ঠিক দিনাজপুরে নহে; দিনাজপুরের নিকটবর্ত্তী দেবকোটে। তিনি রাজসরকারে কাজ করিতে আসিয়া ১০ বৎসরকাল দিনাজপুরেই বাস করিতেছিলেন।

শক্তি কষ্টে উথলিত অশ্রুজল সম্বরণ করিয়া বলিল,

"কে রাণী?"

"নিরূপমা"

শক্তির সুন্দর মুখ সহসা ঈর্ষাবিকৃত হইল! শক্তি রাজকুমারের স্মৃতি ধরিয়া কষ্টে দিন যাপন করিতেছে; আর তিনি দু দিন না যাইতেই অন্য নারীর পাণিগ্রহণ করিয়াছেন! ভগবান, পৃথিবীতে তুমি পুরুষ ও নারীকে এতই অসমান করিয়া জন্ম দিয়াছ? একজন কাঁদিয়া মরিবে আর সেই অশ্রুজলে অন্য জনের হাসি ফুটিয়া উঠিবে? একজনকে শোণিত দিয়াছ কি কেবল অন্যের পিপাসা মিটাইবার জন্য!

শক্তির সেই ঈর্ষাবিকৃত কুটিলরেখাঙ্কিত ভ্রূকুটি দেখিয়া রাজকুমার শিহরিয়া উঠিলেন। তাঁহার হৃদয়ে শক্তি যে ভাবে অধিষ্ঠিত, তাহার যে মূর্ত্তি তিনি ভুলিতে পারেন নাই, ইহা ত সে মূর্ত্তি নহে! সেই মোহিনী সৌন্দর্য্যের মধ্যে যে এরূপ সংহারিণী ভীষণ মূর্ত্তি লুক্কায়িত থাকিতে পারে, রাজকুমার তাহা স্বপ্নেও ভাবিতে পারেন নাই!

রাজকুমারকে স্তব্ধ দেখিয়া শক্তি হলাহলপূর্ণ স্বরে বলিল—"তোমাদেরই সাজে! সত্যই ত! আমরা বিশ্বাস করিব,—তোমরা ছলনা করিবে! আমরা তোমাদের ধ্যানে জীবন পাত

করিব ;—তোমরা ফুলে ফুলে মধু লুটিয়া বেড়াইবে! আমরা তোমাদের পদতলে পড়িয়া থাকিব ; তোমরা দলিয়া দলিয়া চলিয়া যাইবে! তোমাদের খেলা ; আর আমাদের মৃত্যু!”

রাজকুমারের বাকস্ফূর্ত্তি হইল না, প্রফুল্ল কুসুমে সর্পমূর্ত্তি দেখিয়া তিনি বিস্ময়স্তম্ভিত! শক্তির সেই ভ্রুকুটিভরা বিষময় ভাব সম্মুখে করিয়া তাঁহার সেই ভক্তিমতী, নির্ভরপরায়ণা, ক্ষমা-শীলা, নিরুপমার কোমল করুণ মুখশ্রী মনে জাগিয়া উঠিল, এতক্ষণ তিনি তাহাকে ভুলিয়া গিয়াছিলেন। তিনি মনশ্চক্ষে দেখিলেন, এই ঈর্ষা-কুরূপ শক্তিময়ী তাঁহার রাণী, আর নিরুপমা—সেই সুকুমার সুকোমল কুসুমলতিকা তাঁহার আলিঙ্গনবিচ্ছিন্ন, দলিত শুষ্ক, ভূমিতলে লুণ্ঠিত! তিনি শিহরিয়া উঠিলেন।

তিনি যদিও নিরুপমাকে সমস্ত হৃদয় দিয়া ভাল বাসিতে পারেন নাই, কেননা বাল্যপ্রেম এখনও তাঁহার হৃদয়ে জাগরূক, কিন্তু সে প্রেম এমন অন্তঃশীলারূপে এমন স্বপ্নময় স্মৃতিরূপে তাঁহার হৃদয়ে ব্যাপ্ত হইয়া ছিল, যে তাহাতে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে তাঁহার দাম্পত্য প্রেমের কোন ব্যাঘাত জন্মে নাই। ভক্তের আরাধ্য দেবতার মত শক্তি তাঁহার স্মৃতিগত কল্পনা মাত্র, রক্ত মাংস বিশিষ্ট দোষ গুণ সম্পন্ন মানুষ নহে, মানস পূজার গুণ রাশি সমূহ ; বাসনা কামনা প্রবৃত্তির অগম্য অপ্রাপ্য ধ্যান ধারণার বিষয়,—আত্মার অনুভাব মাত্র ;—আর নিরুপমা তাঁহার বিবা-হিতা পত্নী, তাঁহার সন্তানের মাতা, তাঁহার সুখ দুঃখের অধিকারী ; সুতরাং তাহার প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধা ভক্তি করুণা স্নেহের কিছুমাত্র অভাব ছিল না। অভাব যাহা ছিল, তাহা অন্য কিছুর—সেই আত্মপরিপূর্ণকারী প্রেমের অভাব। কিন্তু নিরুপমার কোমল

গুণরাশি, তাহার পরিপূর্ণ আত্মদান, তাঁহাকে এতদিন সে অভাব জ্ঞাতসারে অনুভব করিতে দেয় নাই। আজ যখন তাঁহার মানসীদেবী মূর্ত্তিমতীরূপে তাঁহার সম্মুখে উদয় হইয়াছিল, যখন তাঁহার হৃদয়ের অনুভাব বাহিরের সত্যরূপে তাঁহার সম্মুখে প্রকাশ পাইয়াছিল তখনই তিনি প্রথম অনুভব করিলেন এতকাল ধরিয়া তিনি কি অভাব-সমুদ্রে নিমগ্ন ছিলেন! তিনি তখন আপনাকে ভুলিলেন, জগৎকে ভুলিলেন, নিরুপমাকে পর্য্যন্ত ভুলিলেন, সেই দেবীরূপা মানুষীর মধ্যে, তাহার অমৃতময় সৌন্দর্য্যের মধ্যে তাঁহার সমগ্র বিলুপ্ত হইয়া গেল।

কিন্তু শক্তির এই বিকৃত বিরূপ মূর্ত্তি দেখিয়া তাঁহার যখন সে মোহ ভঙ্গ হইল, তখন দেখিলেন তিনি কি বিষম ভ্রমে পড়িয়া ছিলেন! তখন তিনি বুঝিলেন, এ শক্তি তাঁহার সে শক্তি নহে,—তাঁহার ধ্যান ধারণার সে দেবী নহে, তাঁহার অন্তরের পরিপূর্ণ সে সৌন্দর্য্য-কল্পনা নহে; অসুন্দর লুক্কায়িত হলাহল কালিমা এ মূর্ত্তিতে পরিব্যাপ্ত! তখন নিরাশ-চেতন হইয়া তাঁহার আবার নিরুপমাকে মনে পড়িল, তাঁহার কর্ত্তব্য-বোধ জন্মিল। সেই সরল বিশ্বস্ত হৃদয়ের অসীম ভালবাসা, পরিপূর্ণ নির্ভরতার প্রতিদানে তিনি কি না স্বহস্তে তাহাকে সপত্নীর অনলে নিক্ষেপ করিতে যাইতে-ছিলেন! নিরুপমার বেদনাজ্বালা তিনি নিজের সর্ব্বাঙ্গে যেন অনুভব করিতে লাগিলেন।

এত কষ্টে, এত কঠোর তিরস্কার বাক্যে, রাজকুমারকে এই-রূপ অটল নিস্তব্ধ দেখিয়া শক্তির উদ্ধত গর্ব্ব, ক্রুদ্ধ ভ্রূকুটি নীরব অশ্রুস্নিগ্ধ হইয়া মিলাইয়া গেল। 'আমি বড়'-ভাবপূর্ণ দাম্ভিক উদ্ধত লোকের গর্ব্ব প্রতিকূল অবস্থায় সময়ে সময়ে সহিষ্ণু নম্র প্রকৃতদিগের অপেক্ষা অতি সহজে খর্ব্ব হইয়া পড়ে। সংসারে

ইহা একটি আশ্চর্য্য সত্য!

শক্তি ক্ষুব্ধ মর্ম্মাহত হইয়া কাঁদিয়া সকাতরে কহিল, "রাজকুমার, আমাকে ত্যাগ করিও না। তুমি পুরুষ—ইচ্ছা করিলে শত বিবাহ করিতে পার, তবে কেন এই অভাগিনীকে পরিত্যাগ করিবে? তুমিই ধর্ম্মতঃ আমার স্বামী, আমাকে অকূলে ভাসাইও না। তুমি যদি আমাকে ত্যাগ কর, আবার যদি আমার বিবাহ করিতে হয়, তবে মনে রাখিও সে বিবাহ ধর্ম্ম বিবাহ হইবে না, আর সে অধর্ম্মের জন্য পাপের জন্য তুমিই একমাত্র দায়ী!"

শক্তি থামিল। রাজকুমারের নয়নে শক্তির যন্ত্রণাকাতর অশ্রুসিক্ত ম্লান জ্যোৎস্নাদীপ্ত মুখখানি, আর তাঁহার কর্ণে তাহার সেই করুণ কণ্ঠস্বর! ইতিপূর্ব্বের শক্তির সেই অসুন্দর ভাব তিনি তখন ভুলিয়া গেলেন, এবং সঙ্গে সঙ্গে আবার নিরূপমাকেও ভুলিলেন। এখন তাঁহার আর কেহ নাই, আর কিছু নাই। জ্যোৎস্নাদীপ্ত সুন্দর কাননতলে তিনি আর তাঁহার প্রিয়তমা এবং তাহাকে মনোবেদনা দিয়াছেন বলিয়া একটা অনুতাপ বেদনা, ইহাতেই মাত্র তিনি সচেতন। রাজকুমার ব্যথিতচিত্তে শক্তির নিকট সরিয়া বসিলেন, হৃদয়ের করুণ-প্রেম নয়নে পূর্ণ করিয়া শক্তির দিকে চাহিয়া তাহার হাত-খানি ধরিয়া অর্দ্ধস্ফুরিত স্বরে কি বলিতে যাইতেছেন—এমন সময়ে সহসা দুইটি প্রেমিক-হৃদয় কম্পিত করিয়া সেই নিস্তব্ধ নদীতীরে ধ্বনিত হইল "কুলাঙ্গার, পরস্ত্রী স্পর্শ করিতেছিস!" মুখের কথা তাঁহার মুখেই রহিয়া গেল—আর বলা হইল না। রাজকুমার ফিরিয়া চাহিলেন,—তাঁহার মাতার ক্রুদ্ধ মূর্ত্তি তাঁহার নয়নে প্রতিবিম্বিত হইল। রাজকুমার ত্রস্ত ভীত লজ্জিত হইয়া পড়িলেন। কিন্তু শক্তি নির্ভীকভাবে উঠিয়া দাঁড়াইয়া অটলস্বরে বলিল, "মাতঃ, আমি পরস্ত্রী নহি, আমি যুবরাজের ধর্ম্মপত্নী, ঈশ্বর

সমক্ষে আমাদের বিবাহ হইয়াছে।” মাতা ক্রোধে কম্পিত হইয়া বলিলেন,“গণেশ, এ বনোয়ারিলালের কন্যা না ? ইনি তোমার ধর্ম্ম-পত্নী যে দিন হইবেন, সে দিন প্রতাপরায় দেবের বংশ চণ্ডালবংশের অধম হইবে। বনোয়ারিলালের ভগিনী কুলকলঙ্কিনী, সেই লজ্জায় সে দেশ ত্যাগ করিয়াছে, তাহার কন্যা আমার পুত্রবধূ ! দিনাজপুরের রাজরাণী ! আমি জীবিত থাকিতে তাহা হইবে না, তোমার ইচ্ছা হয় তুমি ইহাকে উপপত্নী রাখিতে পার।”

শক্তির সমস্ত প্রকৃতি ক্রোধে ঘৃণায় অপমানে জ্বলিয়া উঠিল। সে বলিল,“মহারাণি, আপনার মহৎবংশের উপযুক্ত কথাই আপনি বলিয়াছেন ! কিন্তু ভগবান ধনী ও দরিদ্রের পক্ষে স্বতন্ত্র নিয়ম করেন নাই। যদি ভগবান থাকেন, যদি আমি আপনার পুত্রকে সত্যই একমনে ভালবাসিয়া থাকি, তবে এক দিন ইহার বিচার হইবে। আজ যাহাকে ঘৃণা করিয়া অকূল সাগরে ভাসাইলেন, আপনার শ্রেষ্ঠবংশ সেই হীন বনোয়ারিলালের বংশের পদানত হইয়াই সম্মান আনন্দ অনুভব করিবে। তাহা যদি না হয় তবে জানিব ভগবান নাই !”

শক্তি এই কথা বলিয়া দ্রুতপদে সেখান হইতে চলিয়া গিয়া একখানি ছায়ার মত সেই বনমধ্যে মিলাইয়া গেল। রাজকুমার ও তাঁহার মাতার কর্ণে তাহার অভিশাপ ভীষণ বজ্রধ্বনির মত ধ্বনিত হইতে লাগিল !

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

উল্কাপিণ্ড যেমন অতিবেগে অল্পক্ষণেই আত্মগতি নিঃশেষিত করিয়া ফেলে, শক্তিও তেমনি উত্তেজিত হৃদয়াবেগে চলিয়া আসিয়া কিছুদূর গিয়াই অবসন্ন নিস্তেজ হইয়া পড়িল। সহসা তাহার নয়নান্ধকারের মধ্যে ঘূর্ণ্যমান দিকবিদিক হারাইয়া গেল, পদতলে কঠিন ধরণী কেন্দ্র পর্য্যন্ত শূন্য হইয়া পড়িল, শক্তি প্রাণপণে বল সংগ্রহ করিয়া বৃক্ষতলে আশ্রয় গ্রহণ করিতে গিয়া ভূপৃষ্ঠে লুণ্ঠিত হইয়া পড়িল। শক্তিকে এ পর্য্যন্ত কেহই যন্ত্রণাকাতর, মূর্চ্ছিত হইতে দেখে নাই! আজ নিশীথ বিশ্ব শক্তির শক্তিহীন অসহায় মূর্ত্তির দিকে বিস্মিত নেত্রে চাহিয়া স্তম্ভিত হইয়া রহিল। কিছুপরে শক্তি পুনরায় চেতনালাভ করিল—তাহার চতুষ্পার্শে বনতলে ঘনীভূত ভীষণ ছায়াপুঞ্জ, মাথার উপর চন্দ্রশূন্য আকাশে প্রজ্জলিত তারকারাশি। সে নিম্ন হইতে ঊর্দ্ধে দৃষ্টিপাত করিল, সকলি তাহার নেত্রতারকায় প্রতিবিম্বিত হইল, অথচ সে কিছুই দেখিল না—বাহিরের আলোক অন্ধকার, সৌন্দর্য্য ভীষণতা, তাহার অন্তরের অনন্ত যন্ত্রণাস্তর ভেদ করিয়া ইন্দ্রিয়বোধ জন্মাইতে অপারক হইল। শক্তি কেবল তাহার হৃদয়ালোড়নে মাত্র সচেতন হইয়া ধীরে ধীরে উঠিয়া বসিল, দেহভার বৃক্ষমূলে ন্যস্ত করিয়া অশ্রুপ্লাবিত নয়নে দক্ষিণ হস্তের প্রতি দৃষ্টিপাত করিল। রাজকুমারকে পরাইবার জন্য কণ্ঠের ফুলমালা খুলিয়া সে যেমন হাতে ধরিয়াছিল, এখনও তেমনি হাতেই রহিয়াছে! মালার

দিকে চাহিয়া আজ আর শক্তির হৃদয় জুড়াইল না, শক্তির বড় যত্নের বড় আদরের সেই অমূল্য ধন মালাগাছি আর সে মালা নহে! যে আশা-বিশ্বাস-সূত্রে গ্রথিত ছিল বলিয়া ইহার অমূল্যত্ব, এখন সে আশা বিশ্বাস ছিন্ন; সুতরাং এখন ইহা আর কিছুই নহে, শুধু অবহেয় শুষ্ক ছিন্ন ফুলদল মাত্র। মালার দিকে চাহিয়া আজ শক্তির জ্বলন্ত বেদনা আরও জ্বলিয়া উঠিল, অশ্রু শুকাইয়া গেল, সন্ধ্যার তীব্র অপমান-স্মৃতিতে তাহার নির্জীব প্রাণ সহসা অস্বাভাবিকরূপে চেতনালাভ করিল। শক্তি দন্তে অধর দংশন করিয়া সেই একত্র-গ্রথিত শুষ্ক ফুলগুলি সূত্রনির্গত, হস্ত-পেষিত, মর্দ্দিত করিয়া ভূমিতলে নিক্ষেপ করিল, তাহার সাধের ফুলদল অণু পরমাণুতে পরিণত হইয়া মৃত্তিকাসাৎ হইল, বালিকা তাহার উপর চরণ রক্ষা করিয়া গর্ব্বিত নির্নিমেষ-নেত্রে সেই দিকে চাহিয়া রহিল। দেখিতে দেখিতে তাহার রোষরক্ত নয়নে আবার অশ্রুলহরী বহিল, অপমানমুদ্রিত ওষ্ঠাধরে নৈরাশ্যবেদনা স্ফুরিত হইতে লাগিল। শক্তি সেই ছিন্ন-ফুলকণিকার উপর লুণ্ঠিত হইয়া পড়িয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া কহিল, "কুমার!—কুমার!—এই তোমার প্রেমের স্মৃতি!" আবার উত্তেজিত ক্রোধে তাহার করুণ-দুঃখ বিরূপ হইয়া উঠিল, সে মুষ্টিবদ্ধ হস্তে হৃদয় চাপিয়া তীব্র স্বরে বলিয়া উঠিল "কোথায় স্মৃতি! স্মৃতি এখন প্রতিশোধ! ভগবান, প্রতিশোধ—প্রতিশোধ!" নিজের স্বরে নিজেই শিহরিয়া উঠিয়া শক্তি নির্ব্বাক, নির্জীব, নিস্পন্দ হইয়া রহিল। নিস্তব্ধ নিশায় সেই ক্রুদ্ধ স্বর কাননে প্রতিধ্বনি তুলিল—প্রতিশোধ—প্রতিশোধ—প্রতিশোধ!!!

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

ধরা-বিলুণ্ঠিত শক্তি সহসা কাহার যেন হস্তস্পর্শ অনুভব করিল। চমকিয়া মুখ উঠাইয়া ক্রুদ্ধস্বরে বলিল—"কে তুই ?"

উত্তর হইল "আমি মুসলমান !"

অপর কোন বালিকা হইলে এ অবস্থায় নিতান্ত ভীত হইয়া পড়িত। কিন্তু শক্তি একে স্বভাবতই সাহসী, তাহাতে অবস্থাচক্রে পড়িয়া সম্পূর্ণরূপে আত্মনির্ভর নিপুণ হইয়াছে; সুতরাং অপরিচিত পুরুষ দেখিয়া ভয় পাইল না, কেবল যবনের স্পর্দ্ধায় ক্রুদ্ধ ও স্পর্শে ঘৃণাবোধ করিয়া সতেজে উঠিয়া বসিল, এবং রূঢ়স্বরে ক্রুদ্ধ মনোভাব ব্যক্ত করিয়া বলিল, "কোথাকার তুই হতভাগা! আমাকে স্পর্শ করলি যে!"

মুসলমান আস্তে আস্তে বলিল, "আমি ভাবিয়াছিলাম তুমি অজ্ঞান হইয়া পড়িয়াছ—"

তাহার কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই শক্তি কঠোর স্বরে কহিল, "আমি অজ্ঞান হই বা না হই তোর তাতে কি ? তুই যবন হয়ে আমাকে স্পর্শ করলি !"

যবন বৃক্ষতলে বসিয়া মাথার পাগড়িটা খুলিয়া আবার ভাল করিয়া মাথায় বাঁধিতেছিল, বাঁধিতে বাঁধিতে বলিল, "তাহাতে দোষ কি ? তোমাকে যে বিধাতা যে পদার্থে সৃষ্টি করিয়াছেন, আমাকেও সেই বিধাতা সেই একই পদার্থে সৃষ্টি করিয়াছেন। তুমিও যে আমিও সে, তবে আর আমার স্পর্শে দোষ কি ?"

শক্তি। মূর্খ! তুই পুরুষ আমি স্ত্রী, তুই মুসলমান আমি হিন্দু, তোর নীচ বংশ নীচ ধর্ম্ম, আমার শ্রেষ্ঠ বংশ শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম! ভগবান আমাদের দুজনকে সৃষ্টি করিয়াছেন সত্য, কিন্তু এক করিয়া ত আর গড়েন নাই, তুই স্বতন্ত্র লোক আমি স্বতন্ত্র লোক!

মুসলমান হাসিল। অন্ধকারে তাহার মুখের বিদ্রূপ-ভ্রুকুটিরেখা দেখা গেল না, কিন্তু স্বরে তাহা সুস্পষ্ট হইয়া উঠিল। সে বলিল, 'হ্যাঁ, ভগবান সকলকে স্বতন্ত্র করিয়া গড়িয়াছেন সত্য, কিন্তু স্বতন্ত্র নিয়মে ত গড়েন নাই! একই চেতনা হিন্দু মুসলমান ধনী দরিদ্রের মধ্যে সঞ্চারিত, একই ন্যায়-ধর্ম্মে তাহারা প্রতিপালিত, বিধাতার নিকট সকলেই সমান।"

গণেশদেবের মাতার নিকট অপমানিত হইয়া শক্তি কিছু-পূর্ব্বে এই ভাব মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিয়াছিল—এখন যবনের মুখে সে যেন তাহারি অভিশাপবাক্যের উপহাস-প্রতিধ্বনি শুনিল! শক্তি কিঞ্চিৎ স্তম্ভিত হইল; বুঝিল মুসলমান সামান্য লোক নহেন, তাহার মনের কথা তাঁহার নিকট অবিদিত নাই। কিছু পরে সহসা সে জিজ্ঞাসা করিল,—"তা যদি—যদি সবাই সংসারে সমান—তবে এ ভেদজ্ঞান কেন?"

উত্তর হইল—"অজ্ঞানতা—মায়া!"

শক্তি। এ মায়ার আবশ্যক কি? এই মায়াই যখন সমস্ত কষ্টের কারণ, তখন ভগবান এই মায়া, এই অজ্ঞানতা জগৎ হইতে দূর করিয়া দেন না কেন?

উ। দূর করিলে সৃষ্টি থাকে না যে! তাঁহার সৃষ্টি রক্ষার জন্য, তাঁহার উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্যই এই মায়ার আবশ্যক।

শক্তি। আমাদের অনন্ত যন্ত্রণা দিয়াই তাহা হইলে ভগবানের উদ্দেশ্যসিদ্ধি! বিধাতা দয়াময় নহেন—তিনি নিষ্ঠুর নির্ম্মম?

উ। তিনি নিষ্ঠুরও বটেন দয়াময়ও বটেন! তাঁহার উদ্দেশ্য যে সিদ্ধ করিয়া চলে তিনি তাহাকে সুখ দেন, তাঁহার উদ্দেশ্য যে সিদ্ধ করিতে চাহেনা তিনি তাহাকে দুঃখ দেন।

সকল কথা শক্তির মস্তিষ্কে ভালরূপ প্রবেশ করিল না। সে যন্ত্রণা-উত্তেজিত হৃদয়ে বলিল, "ভগবানও প্রতিশোধ চাহেন! কোথাও তবে মার্জ্জনা নাই! তবে এই ক্ষুদ্র রমণীর প্রতিশোধ-স্পৃহাও দোষের নহে?"

উত্তর হইল—"দোষের যদি হইবে তবে ভগবান এ প্রবৃত্তি দিলেন কেন? অন্যায়ের যদি প্রতিফল না থাকিত তবে ভগবান ত ন্যায়বান হইতেন না। ন্যায়ই অন্যায়ের প্রতিশোধ!"

শক্তি। আমি তাহাই চাই। প্রতিশোধ—ভগবান—প্রতিশোধ! কিন্তু সে বিশ্বাসঘাতকতার—এ মর্ম্ম-যন্ত্রণার প্রতিশোধ কি সংসারে কিছু আছে?

মুসলমান গম্ভীর স্বরে দৈববাণীর মত বলিল, "শোণিত-পাত, শোণিত-পাত! ভগবান তোমাকে—"

শক্তি আর শুনিতে পারিল না। ফকিরের অঙ্কিত প্রতিশোধ-চিত্রে ক্রুদ্ধ অপমানিত বালিকা-হৃদয়ও শিহরিয়া উঠিল। সে বলিল, "না, আমি তাহার মৃত্যু চাহিনা,—তাহাতে আমার প্রতি-শোধ-স্পৃহা নিবৃত্তি হইবে না। আমি তাহাকে চাই। যে দিন দেখিব গণেশদেব আমার প্রেমে উন্মত্ত হইয়া মাতাপরিবার রাজ্য সম্পদ সমস্তই বিসর্জ্জন দিতে প্রস্তুত,—যে দিন দেখিব আমার একটি অনুগ্রহ বাক্য পাইবার জন্য নরকে যাইতেও সে কুণ্ঠিত

নহে, সেই দিন এ হৃদয়ের আশা পূর্ণ হইবে, তাহাতেই আমার প্রতিশোধ-স্পৃহা পরিতৃপ্ত হইবে, অপর কিছুতে নহে!"

মুসলমান শুষ্ক হাসি হাসিয়া বলিল, "ইচ্ছা করিলে যে শত শত রাজা মহারাজার হৃদয় দলিত করিতে পারে, সে আজ সামান্য অনুগ্রহের ভিখারিণী—ইহাই কি তাহার প্রতিশোধ!' '

সেই পুরাতন কথা! গণকেরা সকলে এক বাক্যে এই এক কথাই বলিয়া আসিতেছে! এমন কি তাহার পিতা যে এখনও তাহার বিবাহ দেন নাই, তাহার কারণও এইরূপ ভবিষ্যদ্বাণী। কোষ্টির গণনায় পঞ্চদশ বৎসরে শক্তি স্বয়ম্বরা হইয়া রাজ-রাজেশ্বরী হইবে, পিতা সেই জন্য তাহার বিবাহে নিশ্চেষ্ট। তিনি জানেন ঠিক সময়ে কোষ্টির গণনা সফল হইবেই হইবে। শক্তিরও এতদিন পর্য্যন্ত ইহাতে দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, কিন্তু আজ সে জানিয়াছে সমস্ত মিথ্যা—তাহার রূপ মিথ্যা, কোষ্টি মিথ্যা, আশা কল্পনা সমস্তই মিথ্যা। সুতরাং আহ্লাদের পরিবর্ত্তে মুসলমানের এই কথায় সে ক্রুদ্ধ হইয়া বলিল, "ওকথা অনেক শুনিয়াছি আর পারি না! সাধুজনের মুখে এরূপ উপহাস শোভা পায় না। একজনের হৃদয় চাহিয়া যে পায় নাই, শত শত রাজা মহারাজার হৃদয় চাহিয়া সে পাইবে কেমন করিয়া!"

মু। উপহাস নহে। অনেকের সুখ দুঃখ মাপিতেই বিধাতা তোমাকে জন্ম দিয়াছেন, ক্ষমতা তোমার দাসস্বরূপ,—তুমি রাজরাজেশ্বরী—

শক্তি একটু অবিশ্বাসের হাসি হাসিল। সেই হাসির মধ্য দিয়া নৈরাশ্যাপমানের তীব্রজ্বালা সুস্পষ্ট হইয়া উঠিল। সে বলিল, "বিধাতা আমাকে ক্ষমতাশালিনী করিবেন—এক দিন আমিও

এইরূপ মনে ভাবিতাম! কিন্তু এখন দেখিতেছি তাহা বামনের দুরাশা মাত্র। দরিদ্রকন্যা শক্তিময়ী রাজরাণী হইবে কিরূপে?”

মু। মৎস্যগন্ধা রাজরাণী, রাজমাতা হইল কেমন করিয়া? আমি দিব্যচক্ষে দেখিতেছি এই সুবিস্তীর্ণ বঙ্গদেশের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত তোমারি ক্ষমতা প্রভাবে চালিত হইতেছে।— শক্তিময়ি—রাজরাজেশ্বরী বঙ্গেশ্বরী!

শক্তি স্তম্ভিত হইল, মুসলমানের স্বরে সত্য প্রতিভাত। মুহূর্ত্তের জন্য সে তাহার অপমানবেদনা নৈরাশ্যকষ্ট ভুলিয়া কৌতূহলোদ্দীপ্ত হৃদয়ে কহিল, “আমি বঙ্গের ভাগ্য পরিচালনা করিব! আমি বঙ্গেশ্বরী! ফকিরজি, অত আশা আমার নাই, কখন ছিলও না। যাহা ছিল তাহা অত উচ্চ নহে, কিন্তু তাহাও আজ ভাঙ্গিয়াছে!”

মুসলমান কহিল—“তোমার অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন তাই ভাঙ্গিয়াছে। সামান্য প্রেমের দাসত্ব করা তোমার জীবনের উদ্দেশ্য নহে,— সুলতানপুত্র তোমার প্রেমে উন্মাদ—তিনি তোমাকে বিবাহ করিতে চাহেন,—আমি তাঁহার দূতস্বরূপ তোমার নিকট আসিয়াছি।”

শক্তি এতক্ষণ মুসলমানের কথা ঠিক ধরিতে পারে নাই— তাহার মনের দেবতাকেই এতক্ষণ সে মুসলমানের কথার লক্ষ্য বলিয়া কল্পনা করিতেছিল,—সে মনে করিতেছিল,—মুসলমান বলিতেছে, এখনও তাহার আশা নিভে নাই, সে এখনও গণেশদেবের পত্নী হইবে, তাই তাহার কথায় বিশ্বাস স্থাপন করিতে তাহার ভরসা কুলাইয়া উঠে নাই। কিন্তু যখন বুঝিল মুসলমান অন্য কথা বলিতেছে—সুলতানপুত্র তাহার হস্তপ্রার্থী—তখন আর সে কথায় শক্তি বিস্মিত হইল না, অবিশ্বাস করিল না।

শক্তি দেখিল তাহার চরণতলে বিপুল সাম্রাজ্য লুণ্ঠিত; আর কি দেখিল? দেখিল—রাজকুমারের নিকট, তাঁহার মাতার নিকট, এখন সে আর নিতান্তই দীন হীন নহে—সে এখন তাঁহাদেরও ভাগ্যনিয়ন্তা! ইহাতে সে যেমন গর্ব্বময় আহ্লাদ অনুভব করিল, এমন রাজরাজেশ্বরী হইয়াছে ভাবিয়াও নহে!

বাল্যকাল হইতে শক্তির হৃদয়ে দুই প্রবৃত্তি অত্যন্ত বলবতী, রাজকুমারের প্রতি ভালবাসা এবং উচ্চ হইবার বাসনা। এই দুই ভাবকে এতদিন ধরিয়া একত্রে তাহার হৃদয়-শোণিতে শক্তি পোষণ করিয়া আসিতেছিল। মুহূর্ত্ত পূর্ব্বে একটি আশা তাহার ভাঙ্গিয়াছে—রাজকুমার আর তাঁহার নহেন। কিন্তু ঐশ্বর্য্যের হস্ত তাহার প্রতি এখন প্রসারিত—সে তাহাকে বরণ করিবে না উপেক্ষা করিয়া ফিরিবে? শক্তি খানিকক্ষণ নির্ব্বাক হইয়া রহিল; তাহার পর বলিল—"কিন্তু তিনি যে মুসলমান, আমি যে হিন্দু!"

মু। উহা মনের ভ্রান্তি মাত্র—ভগবান ত একই। সকলেই ত তাঁহাকে ডাকিতেছি—নামভেদে কি আসে যায়!

শক্তি তাহার কথা মন দিয়া শুনিতেছিল না। সে ততক্ষণ মনের ভিতর মন দিয়া দেখিল, ঐশ্বর্য্যের আলিঙ্গনে তাহার সম্পূর্ণ পরিতৃপ্তি নাই, রাজকুমার নহিলে তাহার সমস্তই বৃথা। সে বলিল, "কিন্তু আমি তাহাকে চাই।"

উত্তর হইল—"পাইবে না।"

"কখনও না?"

"কখনও না!"

"ঠিক বলিতেছ?"

"ঠিক বলিতেছি! সে তোমাকে পত্নীরূপে গ্রহণ করিবে না। এখন বল সুলতানী—হইবে—না—"

তাহার কথা শেষ না হইতেই শক্তি উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল—"এখন আমি চলিলাম; উত্তর কাল দিব।"

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

বালিকা চলিল, অন্ধকার বনপথে একাকী চলিল। কি ঘোর ভীষণতা চারিদিকে আধিপত্য বিস্তার করিয়াছে; কি এক অদৃশ্য বিকট ছায়া যেন অন্ধকারের অনন্ত সীমা হইতে উঠিয়া বালিকার অনুসরণ করিতে করিতে নীরব অট্টহাসি হাসিয়া ভীমগর্জ্জনে বলিয়া উঠিতেছে "পাইবে না—তাহাকে পাইবে না!" শক্তির নির্ভীক হৃদয়ও তাহাতে শিহরিয়া উঠিতেছে, চকিতনেত্রে চকিত পদক্ষেপে বালিকা বৃক্ষান্তরালের ক্ষণবিভাসিত ক্ষণনির্ব্বাপিত ক্ষীণালোক লক্ষ্য করিয়া অগ্রসর হইতেছে।

বনপ্রান্তে জীর্ণ পুরাতন কালিকা মন্দির। বালিকা দ্বারবর্ত্তী হইল, দ্বার উন্মুক্ত দেখিয়া মন্দির মধ্যে প্রবেশ করিল। মৃণ্ময় বা পাষাণ দেব-দেবীর মূর্ত্তি এখানে নাই, দীপোজ্জ্বল কক্ষে অজিনচর্ম্মোপরি করুণারূপিণী রমণীর প্রশান্ত সৌম্যমূর্ত্তি। শক্তি আসিতেই মন্দিরসেবাধারিণী যোগিনী তাহাকে ভর্ৎসনা করিয়া বলিলেন, "বৎসে, আমি তোমার জন্য নিতান্ত উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিয়াছিলাম। এত রাত্রি পর্য্যন্ত কোথায় ছিলে? তুমি এরূপ স্বেচ্ছাচারিণী

জানিলে কখনই আমি তোমাকে এখানে রাখিতে সম্মত হইতাম না।"—শক্তির পিতা অল্পদিনের জন্য যোগিনীর নিকট কন্যাকে রাখিয়া অন্যত্র গিয়াছেন।

শক্তি প্রশান্ত ভাবে যোগিনীর ভৎ র্সনা বাক্য শুনিল, শুনিয়া আত্মদোষক্ষালনের কিছুমাত্র প্রয়াস না পাইয়া উত্তরে শুধু বলিল, "রাজকুমার আসিয়াছেন।" বেশী কিছু বলিবার আবশ্যকও ছিল না; তাহার মন্দিরে ফিরিতে বিলম্ব হইবার কারণ যোগিনী ইহাতে বুঝিলেন। আর কে সে রাজকুমার যাহার সহিত সাক্ষাতে শক্তি বাড়ী আসিতে ভুলিয়া গিয়াছিল, তাহাও অনুমান করিয়া লইলেন। তাঁহার অনুমান সত্য কি না ইহা যাচাই করিবার অভিপ্রায়ে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন "রাজকুমার কে?"

শক্তি। বাল্যসখা গণেশদেব, দিনাজপুরের বর্ত্তমান রাজা।

যোগিনী। সূর্য্যদেবের তাহা হইলে মৃত্যু হইয়াছে!"

শক্তি সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়িল। যোগিনী অর্দ্ধস্ফুটস্বরে একবার বলিলেন, "ওঁ শান্তি শান্তি!" তাহার পর নিস্তব্ধ ভাব ধারণ করিলেন। শক্তি জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি তাঁহাকে জানিতেন নাকি?" কিন্তু যোগিনী তাহার কোনও উত্তর না করিয়া কিছু পরে কহিলেন, "বৎসে, তুমি যুবতী কন্যা, রাজকুমার তোমার শৈশব-সখা হইলেও তাঁহার সহিত এরূপ একত্রবাস তোমার পক্ষে নিতান্ত অকর্ত্তব্য!"

শক্তি। আমরা বিবাহিত।

তিনি আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন, "বিবাহিত! কই তোমার পিতার নিকট ত এ কথা কখনও শুনি নাই!"

শক্তি। তিনি জানেন না। আমাদের গান্ধর্ব্ব বিবাহ হইয়াছিল!

শক্তি তাহাদের খেলার বিবাহ-বৃত্তান্ত বলিল। যোগিনী একটুখানি করুণ হাসি হাসিয়া বলিলেন, "বৎসে, তোমার অপরাধ নাই। এ সংসার খেলার ঘর, ভগবান স্বয়ং খেলায় মুগ্ধ হইয়াছিলেন—আর তুমি ত শিশুমতি বালিকা! তুমি যে খেলাকে সত্য ভাবিতেছ তাহাতে আর আশ্চর্য্য হইবার কি আছে! কিন্তু রাজকুমারেরও কি এই ভাব? তিনি কি তাঁহার খেলার বধূকে এখন পরিণীতা বধূরূপে গ্রহণ করিতে প্রস্তুত?"

যোগিনীও তাহাতে সন্দেহ প্রকাশ করিতেছেন! কেহ কি অন্য ভাবের কথা বলিবে না, আশ্বাস কি কোথাও নাই! সকলের মনে কি ঐ একই ভাব, মুখে কি ঐ একই কথা! সকলেই কি বলিবে,—"তাহাকে পাইবে না!—তাহাকে পাইবে না!!"

ঐ কথা শুনিতে শুনিতে সে যেন পাগল হইয়া উঠিল; নৈরাশ্যের সুতীব্র প্রবল বাত্যায় আহত হইয়া তাহার হৃদয়নিহিত কোমল করুণ ভাবটুকু দারুণ কঠোরতায় যেন জমাটবদ্ধ হইয়া গেল। ক্রুদ্ধস্বরে সে বলিয়া উঠিল, "যদি সে তাহা না করে তবে আমি তাহার উচ্ছেদ সাধন করিব!"

কিছুক্ষণ পূর্ব্বে মুসলমানের মুখে এই কথা শুনিয়া শক্তি শিহরিয়া উঠিয়াছিল, কিন্তু এখন নিজের মুখে অবাধে সে ঐ কথাই বলিল। শক্তি ক্রোধাবেগ সংযত করিবার জন্য একটু থামিল; তাহার পর বলিল—"দেবি, আমি তোমাকে সেই কথাই বলিতে আসিয়াছি। আমি উপেক্ষিত, আমি প্রত্যাখ্যাত, ইহার প্রতিশোধ চাই! আমি তাহাকে চাই; সে আমার পদানত হউক, আমি এই চাই; যদি তাহা না হয়—তবে—"

যোগিনী। বৎসে, শান্ত হও। কোমলপ্রকৃতি স্ত্রীলোকের

প্রতিশোধ প্রবৃত্তি নিতান্ত অশোভন, জঘন্য, বীভৎস। তুমি কি মনে কর তোমারই আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করিবার জন্য, তোমার অঙ্গুলি তাড়নে চালিত হইবার জন্য বিশ্বসংসার সৃষ্ট হইয়াছে? ভগবানকে তোমার বাধাবিঘ্নের পথে, কণ্টক পথে চাণক্য নিয়োজিত করিয়া তবে কি তুমি এ পৃথিবীতে জন্ম গ্রহণ করিয়াছ? বৎসে, বৃথা রাগ করিতেছ! রাজকুমার বাল্যকালে তোমার সহিত খেলা করিয়াছেন বলিয়া আজ তোমাকে বিবাহ করিতে বাধ্য নহেন; তোমার আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করা তাঁহার কর্ত্তব্য নহে। তোমার কষ্ট তোমারই কর্ম্মফল—তাঁহাকে দোষী করা বৃথা। তুমি চাহিয়া তাঁহাকে পাইতেছ না বলিয়া যে তাঁহার অন্যায় ভাবিতেছ, প্রতিশোধ আকাঙ্ক্ষায় জর্জ্জরিত হইতেছ; কিন্তু ভাবিয়া দেখ ভিক্ষুকের অধিকার কতটুক? প্রকৃত পক্ষে তিনি তোমার প্রতি কিছুই অন্যায় করেন নাই; তুমিই তাঁহার প্রতি অন্যায় দাবী করিতেছ!

শক্তি উগ্রস্বরে কহিল, "অন্যায় দাবী! বিশ্বাসের অধিকার, প্রেমের অধিকার, হৃদয়ের অধিকার, কি সর্ব্বোচ্চ অধিকার নহে? ভিক্ষুকও যদি সর্ব্বপ্রাণে দাতার করুণার প্রতি নির্ভর করে তবে তাহাকে ফিরান দাতার অকর্ত্তব্য! আর তৎগতপ্রাণা, অনন্যহৃদয়া রমণীকে প্রত্যাখ্যান করিয়া সে অন্যায় করে নাই? সংসারের ন্যায়ান্যায় ধর্ম্মাধর্ম্ম আমি জানি না, কিন্তু হৃদয়ের ধর্ম্মে ভগবদ্ধর্ম্মে তাঁহাকে দোষী বলিতেছে। আমি জানি আমার বিশ্বাস ভাঙ্গিয়া সর্ব্বোচ্চ ধর্ম্ম হৃদয়ের ধর্ম্ম, সর্ব্বোচ্চ কর্ত্তব্য হৃদয়ের কর্ত্তব্য সে ভঙ্গ করিয়াছে!"

যোগিনী। বৎসে, তুমি ভুল করিতেছ। হৃদয়ের ধর্ম্ম উচ্চ ধর্ম্ম, হৃদয়ের অধিকার উচ্চাধিকার, সন্দেহ নাই। কিন্তু হৃদয়ধর্ম্ম

বলি কাহাকে? পারস্পরিক প্রেমভাবই হৃদয়ধর্ম্ম। তুমি যাহাকে ভালবাস সেও যদি তোমাকে ভালবাসে—তবেই ত প্রণয়-বন্ধন; তবেই ত পরস্পরের প্রতি পরস্পরের কর্ত্তব্য, অধিকার! এই বন্ধন ছিন্ন করিলে বটে—বিশ্বাস ভঙ্গ, কর্ত্তব্য ভঙ্গ, ধর্ম্ম ভঙ্গ করা হয়! কিন্তু রাজকুমার বাল্যকালে তোমার সহিত খেলা করিয়াছেন বলিয়া তোমার সহিত প্রেমসূত্রে আবদ্ধ এরূপ কল্পনা করা, আশা করা নিতান্ত অসঙ্গত। প্রেমধর্ম্ম যৌবনধর্ম্ম, বিশেষতঃ পুরুষের পক্ষে। বাল্যকাল হইতে তুমি তাঁহার নিকট হইতে দূরে, তোমার প্রতি অনুরাগ সঞ্চারের অবসরও তাঁহার ঘটে নাই; কিম্বা বিনা অনুরাগ সত্বেও যথাসময়ে যথানিয়মে তোমাকে তাঁহার পাত্রী মনোনীত করেন নাই—এ অবস্থায় হৃদয়ধর্ম্মে বা সমাজধর্ম্মে, কোন ধর্ম্মেই তিনি তোমার প্রতি অন্যায়াচরণ করেন নাই। এক-পক্ষ প্রেমের কোনই অধিকার নাই, তুমি অনুগ্রহের ভিখারী মাত্র অধিকার ভিক্ষাতেও আছে সত্য—যখন ভিক্ষা ন্যায্য প্রাপ্য, নহিলে অন্যায় ভিক্ষা যে চাহে সে অনধিকার দান চাহে, তাহা হইতে বঞ্চিত হইলে কাহারও প্রতি রাগ করিবার কোনও অধিকার নাই।"

শক্তি বলিল, "এক-পক্ষ প্রেম! তবে প্রতিদিন কেন সে আমায় ভালবাসা দেখাইত? কেন সে ফুলের মালা পরাইয়া আমাকে তাহার রাণী করিয়াছিল?"

যোগিনী। বৎসে, সে বালকের খেলা! কোমলমতি বালকে কিছু আর তুমি যুবকের দায়িত্ব অর্পণ করিতে পার না।

শক্তি। আমিও কি তখন বালিকা ছিলাম না! আমি যে তখন হইতেই তাহাকে পূর্ণ প্রাণে ভাল বাসিতেছি; আর তাহার প্রেম,

তাহার শপথ বালকের খেলা! তাহা নহে; আজও তাহার প্রতি কথায় প্রতি কটাক্ষে তাহার অন্তর-নিহিত প্রেম ব্যক্ত হইয়াছে; হৃদয়ে হৃদয়ে আমরা একত্ব উপলব্ধি করিয়াছি। কিন্তু সে ভীরু! সে কাপুরুষ! সে বিশ্বাসঘাতক! তাই মাতৃভয়ে মাতার মিথ্যা অপবাদে আমাকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছে! 'বনোয়ারি লালের ভগিনী কলঙ্কিনী'! মিথ্যাবাদিনি, ভগবান যদি থাকেন ত তোমার বংশ এক দিন এই বনোয়ারিলালের বংশের পদানত হইবেই হইবে!

নবম পরিচ্ছেদ।

শক্তি এতক্ষণ উর্দ্ধশ্বাসে বলিয়া যাইতেছিল এখন নিশ্বাস লইবার জন্য সে থামিল, যোগিনীও কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন। তাহার পর বলিলেন, "বৎসে, ভগবান আমাদিগকে দুঃখ কষ্ট দিয়া তাঁহার ন্যায়ধর্ম্ম রক্ষা করেন বলিয়া কি তিনি আমাদের নিকট দোষী! সেইরূপ রাজকুমার তোমাকে ভালবাসিয়াও যদি তোমাকে প্রত্যাখ্যান করিয়া থাকেন তোমার সুখ অবজ্ঞা করিয়া থাকেন, তবে সে কেবল কর্ত্তব্যের অনুরোধে। কর্ত্তব্যের জন্য প্রাণাধিকা তোমা হইতে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করিয়া কেবল তোমার সুখ নহে, তাঁহার নিজের সমস্ত জীবনের সুখশান্তি পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিতেছেন। এরূপ অবস্থায় তিনি প্রতিশোধের পাত্র নহেন, শ্রদ্ধার পাত্র! ভগবান শ্রীরামচন্দ্র কি করিয়াছিলেন! তোমাকে

বিবাহ করিলে যখন তাঁহার বংশে কলঙ্ককালিমা পড়ে, তখন তোমাকে বিবাহ করাই তাঁহার পক্ষে অকর্ত্তব্য।"

শক্তি আগুণ হইয়া বলিয়া উঠিল—"শ্রদ্ধার পাত্র! কোন্ কর্ত্তব্য মানব কর্ত্তব্যের বিরোধী? রামচন্দ্র সীতাকে বনবাস দিয়া মহৎ হৃদয়ের পরিচয় দেন নাই, তাঁহার ভীরু স্বভাবের পরিচয় দিয়া গিয়াছেন মাত্র। এই অবিচারে তাঁহার দেবনামও কলঙ্কিত। সীতা যেমন তাঁহার সহধর্ম্মিণী তেমনি তাঁহার প্রজা; তাঁহাকে লোকভয়ে বিনাদোষে ত্যাগ করিয়া তিনি পতির কর্ত্তব্য, রাজকর্ত্তব্য, ঈশ্বর কর্ত্তব্য সকল কর্ত্তব্যই ভঙ্গ করিয়াছেন।"

যোগিনী। কিন্তু—

শক্তি। ইহাতে কিন্তু নাই। রাজকুমারকে যে পতি বলিয়া জানিত, যে তাঁহার ধ্যানে জীবন সমর্পণ করিয়াছিল, মিথ্যা অপযশ ভয়ে তাহাকে পরিগ্রহণ না করিয়া রাজকুমার যে কেবল নিজের ধর্ম্ম নষ্ট করিয়াছেন এমন নহে, সেই একনিষ্ঠ হৃদয়কে সমাজাচার কর্ত্তৃক অন্য পতিবরণে বাধ্য করিয়া তাহার পর্য্যন্ত ধর্ম্ম নষ্ট করিতেছেন। সে শ্রদ্ধার পাত্র!—ভীরু! কাপুরুষ! অবিচারক! অধর্ম্মাচারী!—আমার পিতৃস্বসা কলঙ্কিনী! স্বর্গ তাঁহাকে স্থান দিয়া পবিত্র হইয়াছে! মিথ্যা কথা! মিথ্যা কথা! মিথ্যা কথা!

শক্তির ক্রুদ্ধ স্বর নিস্তব্ধ নিশীথের সাম্য ভঙ্গ করিয়া ধীরে ধীরে মিলাইয়া পড়িল। যোগিনী তখন স্বাভাবিক সংযত স্বরে কহিলেন, "মিথ্যা নহে,—বৎসে, সে কথা মিথ্যা নহে। আমিই তোমার সেই কলঙ্কিনী পিতৃস্বসা, এখনও জীবিত! স্বর্গে স্থান হইবে কি না জানি না, কিন্তু এখনও পর্য্যন্ত ত নরকেও স্থান হয় নাই।"

শক্তি বিস্ময়-বিস্ফারিত নেত্রে চাহিয়া রহিল। যোগিনী

কহিলেন, "শোন, বৎসে, আমার কলঙ্কিত ইতিহাস শোন—শুনিয়া সাবধান হও। আমিও একদিন ঐরূপ ভাবিতাম, হৃদয়ের ধর্ম্মকেই একমাত্র ধর্ম্ম বলিয়া জানিতাম; হৃদয় দেবতাকে সাক্ষাৎ ভগবান-রূপী বলিয়াই ভাবিতাম; ঈশ্বরের রাজ্যে যাহা কিছু সত্য, শিব, সুন্দর, তাহা তাঁহাতেই উপলব্ধি করিতাম; তাঁহার বাক্য ধ্রুবসত্য, তাঁহার কার্য্য অপাপবিদ্ধ পুণ্যময় বলিয়াই জানিতাম; সংসারের মানুষের ন্যায় যে তাঁহাতে কিম্বা তাঁহার আচরণে পাপ তাপ কলঙ্ক স্পর্শ করিতে পারে—এরূপ ধারণাই আমার ছিল না। কিন্তু পরে বুঝিলাম ইহা মিথ্যা ধারণা, ভ্রান্ত বিশ্বাস! সংসারে জন্মগ্রহণ করিলে ভগবানকেও সংসার নিয়মের অধীন হইতে হয়; সংসার-ধর্ম্ম দিয়া হৃদয়ধর্ম্মকে বাঁধিলেই তবে তাহার পবিত্রতা, তাহার মাহাত্ম্য রক্ষা হয়; নহিলে সমাজধর্ম্মের উল্লঙ্ঘনে হৃদয়ধর্ম্ম উচ্ছৃঙ্খল ব্যভিচারী হইয়া—"

শক্তি আর চুপ করিয়া শুনিতে পারিল না; তাঁহার কথার শেষঅংশ পূরণ করিয়া দিয়া বলিল, 'হাঁ উচ্ছৃঙ্খল ব্যভিচারী হইয়া বিশ্বস্তপ্রাণা সরলা নারীজাতির চির জীবনের সুখশান্তি হরণ করে! আর প্রকৃত দোষী দানব দেবতাগণ এইরূপে পরের সর্ব্বনাশ করিয়া সংসারের লীলাখেলা সম্পন্ন করেন! একবার নহে, সহস্রবার প্রতিশোধ! ভগবান, এ কি তোমার অবিচার! নারীকে কোমল করিয়া গড়িয়াছ কেবল কি পুরুষে তাহাকে পদদলিত করিয়া সুখ অনুভব করিবে বলিয়া?"

যোগিনী। বৎসে, ভগবানের নিন্দা করিও না। ঈশ্বর যাহাদের সহিতে দেন তাহাদের প্রতিই তাঁহার অধিক অনুগ্রহ। পশুর অধিকার অত্যাচার করা, দেবাধিকার অত্যাচার সহ

করিয়া অত্যাচারীর মঙ্গল সাধন করা। অত্যাচার পৃথিবীর বস্তু, ভালবাসা স্বর্গের ধন। কে বলে ভালবাসার বল নাই, তাহার অমিত বল। অত্যাচারীর বলও ইহার নিকট পরাভূত! পরের দুঃখ তাপ ভার বহন করিতে ইহা কখনও কাতর নহে, দুঃখও ইহাকে দুঃখ দিতে অপারক! বিধাতার আমাদের প্রতি কত করুণা, কত স্নেহ, তাই তিনি আমাদিগকে এরূপ অমূল্য ধনের অধিকারী করিয়াছেন!

শক্তি। সহ্য করিয়া যে সুখ পায় সে পাক্, আমার নিকট অত্যাচার, অবিচার—অসহ্য!

যোগিনী। বৎসে, যে দণ্ডনীয় বিধাতা স্বয়ংই তাহাকে দণ্ড দিবেন। পাপপুণ্য, ন্যায়ান্যায়, কর্ম্মাকর্ম্মের বিচারক আমরা নহি। স্ত্রী-জাতির ধর্ম্ম ভালবাসা—ইহা প্রতিশোধের অতীত। বৎসে, ভালবাসিয়া উপেক্ষিত হইবার যে দারুণ কষ্ট তুমি তাহা জানিয়াছ—কিন্তু প্রতিশোধের অতীত হইতে পারিলে যে সুখ লাভ করিবে তাহার মত সুখ আর সংসারে কিছু নাই—তাহা লাভে সচেষ্ট হও।

শক্তি। সে সুখ আমার অদৃষ্টে বিধাতা লেখেন নাই! তাহা হইলে আমার প্রবৃত্তি সেই রূপই হইত। সংসারে ফুলের কার্য্য, কাঁটার কার্য্য এক নহে। কিন্তু তাই বলিয়া কি কাঁটার কোনই আবশ্যকতা নাই—তাহা হইলে বিধাতা তাহাকে গড়িলেন কেন? সংসারে সজ্জন দুর্জ্জন উভয়েই ঈশ্বরের অভিপ্রায় সিদ্ধ করে। সজ্জন সাধুতা দ্বারা, দুর্জ্জন শাস্তি দ্বারা পাপের দণ্ড বিধান করে। ঈশ্বরের সৃষ্টি রক্ষার পক্ষে উভয়েরই আবশ্যক। সংসারে তোমার জন্ম পুণ্যের দ্বারা পাপের ক্ষয় করিতে; আমার

জন্ম, পাপের দ্বারা পাপকে দমন করিতে! কি কর্ম্মফলে বিধাতা আমাকে এরূপ হতভাগ্য করিয়াছেন জানি না। কিন্তু আমিও তাঁহার কার্য্য সিদ্ধি করিতে আসিয়াছি; আমি প্রতিশোধ চাই। সে যদি আমার হয় তবেই তাহার দুষ্কার্য্যের প্রায়শ্চিত্ত, নহিলে ভগবানের কালীরূপিনী বজ্রশক্তির আরাধনায়—

যোগিনী। বৎসে, কালী হিংসাপ্রবৃত্তির চরিতার্থকারিণী নহেন— হিংসাহননকারিণী শক্তি! প্রতিশোধ-কামনায় দেবতা-পূজা দানব ধর্ম্ম—হিন্দুধর্ম্ম, বৌদ্ধধর্ম্ম নহে।

শক্তি। অন্যায়ের প্রতি দণ্ডবিধান যে ধর্ম্মে দেবধর্ম্ম নহে, সে ধর্ম্ম আমার ধর্ম্ম নহে। আমি দেবীর নিকট চলিলাম—তিনি যদি আমার মনস্কামনা সিদ্ধ করেন, তবেই হিন্দুধর্ম্ম আমার ধর্ম্ম;—নহিলে আমি এ ধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিব।

দশম পরিচ্ছেদ।

শক্তি যোগিনীর উত্তরের অপেক্ষা পর্য্যন্ত না করিয়াই দ্রুতপদে সহসা গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল। সেই গৃহের পশ্চাতে জীর্ণ ক্ষীয়মান ইষ্টক দেওয়ালের ব্যবধানে কালীর পীঠস্থান। উদ্যানপথ দিয়া বালিকা তাহার দ্বারস্থ হইল। দ্বার শৃঙ্খলাবদ্ধ ছিল না, অনায়াসে তাহা উদ্ঘাটিত করিয়া ভিতরে প্রবেশ করিল। দুএকটি তারকা-রশ্মি অমনি তাহার অনুবর্ত্তী হইয়া মন্দির অভ্যন্তরগত সুষুপ্ত

ভীষণতাকে সহসা চমকিত, জাগ্রত করিয়া তুলিল। তারকালোক-দীপ্ত করালবদনী কালীর সম্মুখে শক্তি স্তব্ধ নেত্রে দণ্ডায়মান হইল। তাহার মনে হইল, প্রতিমার রক্তিম লোল জিহ্বা তাহার মতন প্রতিশোধ বাসনাতেই যেন লক লক করিয়া উঠিয়াছে, কুৎসিত ঘৃণ্য বীভৎস্য পিশাচ প্রবৃত্তিগণ দেবীর পিপাসা নিবৃত্তির জন্যই যেন নিজ মুক্তপাত্রে অজস্র ধারায় শোণিত ঢালিতেছে! শক্তিকে দেখিবামাত্র সেই রক্তনির্ঝরকণ্ঠ নৃমুণ্ডগণ সহসা বিকট হাস্যোচ্ছ্বাসিত অধরে যেন তাহার দিকে চাহিল; তাহার নয়নে নয়ন সংলগ্ন করিয়া কালীকণ্ঠ হইতে একে একে খসিতে লাগিল; খসিয়া খসিয়া "প্রতিশোধ প্রতিশোধ" শব্দে তাহাকে বেষ্টন করিয়া মহোল্লাসে তাণ্ডব নৃত্য আরম্ভ করিল!

শক্তি তাহাদিগের কর্ত্তৃক আবিষ্ট, হৃতজ্ঞান, আত্মহারা হইয়া তাহাদেরই যেন প্রতিধ্বনি গাহিয়া উত্তেজিত স্বরে বলিয়া উঠিল—"হ্যাঁ প্রতিশোধ প্রতিশোধ; আমি প্রতিশোধ চাই!"

বালিকার স্বর-কম্পন মন্দির-স্তব্ধতায় মিলাইতে না মিলাইতেই হৃৎকম্পকারী মৃদুগম্ভীর স্বরে দৈববাণী হইল—"তথাস্তু! তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হইবে—তোমা কর্ত্তৃক তাহার উচ্ছেদ সাধিত হইবে।"

শক্তি কণ্টকিত দেহে, বিস্ময়বিস্ফারিত নেত্রে গৃহের চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিল, কোথাও কেহ নাই, সম্মুখে একমাত্র নির্ব্বাক নিস্তব্ধ সেই পাষাণ মূর্ত্তি। কিন্তু দেবীর রসনা যেন এখনও কম্পিত হইতেছে, তাঁহার কটাক্ষ যেন রোষযুক্ত—শক্তির সন্দেহে যেন তিনি ক্রুদ্ধ হইয়াছেন। শক্তি কম্পমান হৃদয়ে বলিল, "দেবি! আমি প্রতিশোধ চাহি, কিন্তু রক্তপাত চাহি না। আমি তাহাকে চাহি; সে আমার হউক, আমাকে এই বর দাও।"

আবার মৃদু অথচ বজ্র-গম্ভীর স্বরে উত্তর হইল, "পাইবে না,—তাহাকে পাইবে না"! শক্তির দেহে উষ্ণশোণিত উচ্ছ্বাস বেগে বহিল। সে ক্রুদ্ধ স্বরে কহিল, " ইহা দেবীর বাক্য নহে! কে তুই?" দেবী-প্রতিমার পশ্চাৎ হইতে একজন মনুষ্য অগ্রসর হইয়া দাঁড়াইল। এতক্ষণ অন্ধকারে থাকিয়া শক্তির দর্শনশক্তি প্রখর হইয়া উঠিয়াছিল, মনুষ্য তাহার নিকটস্থ হইলে সে নিরীক্ষণ করিয়া দেখিল তাহা শাক্ত সন্ন্যাসীর মূর্ত্তি। তাহার দেহ রক্তবস্ত্রাবৃত, জটাজুট রক্তজবায় পরিবৃত; কপালে রক্ত চন্দন, কণ্ঠে ভীষণ নরকপাল মালা। শক্তি কিছুক্ষণ তাহার দিকে স্তব্ধভাবে চাহিয়া থাকিয়া আবার জিজ্ঞাসা করিল, "কে তুমি?"

উত্তর হইল, "আমি দেবীর দাস। তাঁহার হইয়া দৈববাণী করিতে তাঁহার আজ্ঞায় এখানে অসিয়াছি, তাঁহার আজ্ঞাই আমার মুখ দিয়া ব্যক্ত হইয়াছে। আমি দেখিতেছি, তোমার উজ্জ্বল ভাগ্যাকাশ ম্লান করিতে একখণ্ড কৃষ্ণমেঘ অগ্রসর, তোমার ভাগ্যের সুখচন্দ্র এক রাহু গ্রাস করিতে উদ্যত, তাহার হাত হইতে পরিত্রাণ না পাইলে তোমার মঙ্গল নাই। যদি নিজের মঙ্গল চাও, যদি শক্তির তেজ কিছুমাত্র হৃদয়ে ধারণ করিয়া থাক, তবে তাহার নিপাতে কৃতসঙ্কল্প হইয়া শক্তির আরাধনা কর। নহিলে মর্ম্ম-ঘাতকের চরণ লাভই যদি তোমার প্রতিশোধের চরম সীমা হয়, তবে সে অভিপ্রায়ে দেবীর আরাধনা করিয়া তাঁহার অপমান করিবার আবশ্যক কি! তাহার চরণে গিয়া পড়,—সমাদর না পাও অনাদরও পাইবে, তাহার পত্নী না হইতে পার উপপত্নীও হইতে পারিবে!"

সন্ধ্যার দৃশ্য আবার তাহার মনে জাগিয়া উঠিল—বিষতেজে

শক্তির সর্ব্বাঙ্গ জর্জ্জরিত হইয়া উঠিল। সে বলিল, "সন্ন্যাসী না পিশাচ! থাম—আর বলিতে হইবে না। আমি চাহি না,—তাহাকে চাহি না—"

উ। চাহিলেও পাইবে না—সে তোমাকে ধর্ম্মপত্নীরূপে গ্রহণ করিবে না। এখন বল সেই মর্ম্মঘাতীর উপপত্নী হইবে—

সহসা আর একজন দেবী-প্রতিমার পশ্চাদ্দেশ হইতে আবির্ভাব হইয়া সন্ন্যাসীর কথা পূরণ করিয়া বলিলেন, "কিম্বা আমার প্রাণেশ্বরী হইবে?"

তখন প্রভাত আরম্ভ হইয়াছে। উষার অস্পষ্ট নবালোকে শক্তি সুলতান-পুত্র গায়সুদ্দিনকে চিনিল। রাজকুমার নিকটে আসিয়া তাহার প্রক্ষিপ্ত হস্ত হস্তে ধারণ করিয়া কহিলেন, "সুন্দরি, বল তুমি বঙ্গেশ্বরী হইবে কি না? তোমাকে না পাইলে আমার রাজ্য ধন সমস্তই বৃথা!" মুহূর্ত্তকাল শক্তি বিচলিতমনা স্তম্ভিত হইয়া রহিল। একদিকে রাজ্য-সম্পদ, প্রেম-সম্মান; অন্যদিকে দারিদ্র্য, অপমান, অবহেলা। একজন তাহার জন্য সর্ব্বস্ব পণ করিতেছে, আর একজনের নিমিত্ত সে সর্ব্বস্ব পণ করিয়াও তাহাকে পাইতেছে না, পাইবার আশাও নাই। এ অবস্থায় নিজের ভাগ্য-নির্ব্বন্ধ স্থির করিতে শক্তির অধিক সময় লাগিল না। মুহূর্ত্তে আত্মস্থ হইয়া সে দৃঢ়স্বরে বলিল, "জাঁহাপনা, আমি তোমার হইলাম!" রাজকুমার কণ্ঠ হইতে যখন হারক-হার উন্মোচন করিয়া তাহার কণ্ঠে পরাইয়া দিলেন, তখন কিন্তু তাহার সে দৃঢ়ভাব রহিল না; তখন সহসা শক্তির মুখ পাণ্ডুবর্ণ হইয়া পড়িল, বদ্ধ ওষ্ঠাধর কমল-দলের ন্যায় সুস্পষ্টরূপে কম্পিত হইয়া উঠিল!

একাদশ পরিচ্ছেদ।

যোগিনী শক্তির কথার উত্তর স্বরূপে কহিলেন, "পাপের দ্বারা পাপের ক্ষয়, অন্যায়ের দ্বারা ন্যায়সাধন, কখনও হইতে পারে না— তাহাতে পাপের ভার, অন্যায়ের ভার, বৃদ্ধি পায় মাত্র। পুণ্যঃ পুণ্যেন কর্ম্মণা ভবতি পাপঃ পাপেন!"

কিন্তু কাহাকে বলিতেছেন? শক্তি কোথায়? তিনি হতাশ্বাস হইয়া নিস্তব্ধ হইলেন। শক্তি দ্বার মুক্ত রাখিয়া চলিয়া গিয়াছিল, চঞ্চল বাত্যাহত হইয়া দীপ সহসা নিভিয়া গেল; বৃক্ষাবলী-ব্যবহিত উত্তরাকাশ খণ্ড অমনি যোগিনীর নয়নে প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। নভোপথে চিরপ্রদক্ষিণশীল অত্যুজ্জ্বল সপ্তর্ষিমণ্ডল চিরস্থির ধ্রুবতারকার হীন কান্তি নির্দ্দেশ করিয়া গর্ব্বিত শোভা বৈচিত্র্য সম্পাদন করিতেছিল। যোগিনী শূন্য দৃষ্টিতে সেই দিকে চাহিয়া ভাবিতে লাগিলেন,—"দেবাধিদেব বিশ্বপতি, সত্যই কি আমাদের প্রবৃত্তির উপর, আমাদের কর্ম্মাকর্ম্মের উপর, আমাদের কোন হাত নাই? তোমার হাতে আমরা ক্রীড়া পুত্তলী মাত্র! যেমন চালাইতেছ তেমনি চলিতেছি? আমাদের পাপ পুণ্য মঙ্গলামঙ্গল সুখ দুঃখের একমাত্র অর্থ একমাত্র উদ্দেশ্য তোমার সৃষ্টি-বৈচিত্র্য রক্ষা! তাহা ছাড়া ইহার অন্য কোন অর্থ বা অন্য কোন উদ্দেশ্য নাই? তবে প্রভো, কর্ত্তাই বা কে? কর্ম্মই বা কি? কর্ম্মের ফল-ভোগই বা কেন? সামান্য ফল ভোগ নহে,— ক্ষুদ্র কর্ম্মবুদ্বুদ একবার বিকম্পিত সঞ্চালিত হইলে কোথায়

তাহার অবসান কে বলিতে পারে? পিতার কর্ম্ম সন্তান সন্ততিতে বহমান, একের অপরাধে অন্যের শাস্তি! আমার অপরাধে, আমার কর্ম্মফলে, কেন প্রভু নিরপরাধ বালিকার এ মর্ম্মদাহ, তাহার সুখহানি? কিম্বা ইহা উপলক্ষ মাত্র—তাহারই কর্ম্মফলে আমার নামের সহিত সম্বন্ধ হইয়া নিজের ভাগ্য নির্ব্বন্ধই এইরূপে পূর্ণ করিতেছে? প্রভু হে! তাহাই সত্য! জগতে তোমার অবিচার নাই—যাহার যাহা প্রাপ্য পরিপূর্ণ মাত্রায় সে তাহা লাভ করিতেছে। আমরা অজ্ঞানমতি, তাই না বুঝিয়া মাঝে মাঝে যন্ত্রণায় কাতর হইয়া তোমার নামে কলঙ্ক ঘোষণা করি!"

যোগিনীর চিন্তা স্তম্ভিত হইল, চিত্তে চিত্ত স্থির করিয়া তিনি নয়ন মুদিত করিলেন। শত শত নক্ষত্র জ্যোতি তাঁহার মূর্দ্ধাপথে বিভাসিত হইয়া উঠিল। সেই আলোকে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের প্রচ্ছন্ন গূঢ় প্রহেলিকা তিনি যেন প্রত্যক্ষের মত অভিব্যক্ত দেখিতে পাইলেন। তখন প্রশান্ত আনন্দময় ভাবে বিভোর হইয়া বলিয়া উঠিলেন, "বিভু হে, তোমার মহিমা অপার! তোমার সৃষ্টিতে সকলি সার্থক! বিশাল বিশ্বব্রহ্মাণ্ড হইতে আর তাহার ক্ষুদ্র অণু পরমাণুটি পর্য্যন্ত কিছুই এ চরাচরে তুচ্ছ নহে, সকলেই সমান উদ্দেশ্যপূর্ণ, সমান মহান্! সর্ব্ব ভূতে তোমার সমান দৃষ্টি, সকলতেই তুমি সমভাবে বিরাজমান।

অণোরণীয়ান্ মহতোমহীয়ান্ আত্মা গুহায়াং নিহিতোহস্য জন্তোঃ।
তমক্রতুং পশ্যতি বীতশোকো ধাতুঃ প্রসাদান্মহিমানমীশম্॥

উন্নতিই তোমার সৃষ্টির মূলতত্ত্ব, আর তোমাকে লাভ সকল উন্নতির চরম পরিণতি। 'সৃষ্ট জগতের জড়াণু হইতে চেতনাত্মা পর্য্যন্ত এই একই লক্ষ্যে জন্মজন্মান্তরব্যাপী উন্নতি চক্রে বিঘূর্ণিত

ধাবিত হইয়া স্ব স্ব বিকাশ সাধন করিতে করিতে জগতের বিকাশ সাধন করিয়া চলিতেছে। এই উন্নতি-যাত্রায় পাপ পুণ্য প্রবৃত্তি নিবৃত্তি সুখ দুঃখ কিছুই নিরর্থক নহে। তাহারা ভব-সমুদ্রের বিভিন্নরূপী পারনৌকা। তবে কোন পথে কোন নৌকায় কোন যাত্রী এ সমুদ্র পারে যাইবার উপযুক্ত তাহা, সর্ব্বজ্ঞ কাণ্ডারী তুমি, তোমার নিকটেই মাত্র বিদিত। ক্ষুদ্রদৃষ্টি আমরা আদি-অন্ত দেখিতে পাই না তাই তুফান দেখিলেই আতঙ্কে মরি। হে বিপদবারণ কাণ্ডারি, তোমার প্রতি নির্ভরচিত্ত হইলে আর কোন ভয় ডর থাকে না। যি পাপ দিয়া পুণ্য ফুটাও প্রবৃত্তি দিয়া নিবৃত্তিতে লইয়া যাও, নিষ্ঠুর হইয়া করুণা প্রকাশ কর। তোমার মহিমা অপার অগম্য? তুমি যাহাকে বোঝাও সেই কেবল বোঝে। আমাকে বুঝাও প্রভু কি উদ্দেশ্যে এখনও আমার এ সংসারে স্থিতি! তোমার করুণাবারি সিঞ্চনে যখন এ অধম জীবন ধন্য করিয়াছ, তখন জীবনের কোন কাজ আর এখনও অসমাপ্ত?"

যোগিনীর চিন্তায় ব্যাঘাত ঘটিল। প্রথমে অশ্বপদধ্বনি শ্রুত হইল, তাহার পর দ্বারদেশে উষ্ণীষধারী অশ্বারোহী এক যবন-মূর্ত্তি প্রভাতালোকে আত্মপ্রকাশ করিয়া কহিল, "বন্দিগি মায়িজি! কামরার বাহিরে আসুন, বাদসাহের মেহেরবাণী জানাইতে আসিয়াছি।"

মায়িজি দ্বারস্থ হইয়া দেখিলেন, অদূরে বৃক্ষতলে একখানি সুসজ্জিত শিবিকার নিকট আরও সৈন্যসামন্ত লোকজন! তিনি দ্বারস্থ অশ্বারোহীকে বলিলেন, "শিবিকা কেন?"

মুসলমান ওমরাহ কহিল, "আমাদের বেগমকে লইবার জন্য।

আপনার এখানে যে খবসুরত যুবতী আছেন তাঁহাকে বাদসাহ সাদি করিবেন—তাঁহাকে লইয়া আসুন।” যোগিনীর স্বাভাবিক শান্ত সংযত ললাটেও বিরক্তির রেখা পড়িল। তিনি বলিলেন, “বাদসাহ কি জানেন না যে যুবতী হিন্দুকন্যা? তাহার সহিত বাদসাহের বিবাহ হইতে পারে না।”

উত্তর হইল, “মুসলমানের হিন্দু বিবাহে বাধা নাই। মুসলমান ধর্ম্ম উদার ধর্ম্ম, জগতের ধর্ম্ম! সে ধর্ম্ম যাহার সে লোক সকলকেই আপনার করিতে পারে।”

যোগিনী বলিলেন, “কিন্তু যুবতী ধর্ম্ম ত্যাগ করিবে কেন?”

সে হাসিয়া বলিল, “নারীজাতির মধ্যে এমন নির্ব্বোধ কেহ নাই যে বাদসাহকে সাদী করিতে নিজের ধর্ম্ম ত্যাগ না করে। আপনি তাহাকে লইয়া আসুন, তাহার পর সে বন্দোবস্ত আমরা করিব।”

যোগিনী দৃঢ় স্বরে বলিলেন, “না, তাহা হইবে না। তাহার পিতা আমার কাছে তাহাকে রাখিয়া গিয়াছেন, যে পর্য্যন্ত তিনি ফিরিয়া না আসেন সে পর্য্যন্ত আমি তাহাকে তোমাদের নিকট দিতে পারি না।”

ওমরাহ কহিল, “আপনি রাজাজ্ঞা লঙ্ঘন করিতেছেন!—ইচ্ছা সুখে যদি তাহাকে না দেন তবে আমি গৃহে প্রবেশ করিব।” যোগিনী বলিলেন, “প্রজা রক্ষার ভার রাজার হস্তে ন্যস্ত—প্রজার প্রতি অত্যাচারের ক্ষমতা তাঁহার নাই! আমি তাহাকে দিব না, তুমি বাদসাহকে গিয়া”—

অশ্বারোহী বলিল, “যদি ভাল চাহেন তাহাকে দিন; না দিলে রাজবিদ্রোহী বলিয়া আপনাকে ধরিতে হুকুম দিব—”

বলিতে বলিতে সৈনিক অশ্ব হইতে অবতরণ করিল। তাহা দেখিয়া যোগিনী বিদ্যুদ্বেগে গৃহ নিষ্ক্রান্ত হইয়া কালী-মন্দিরের দিকে ছুটিলেন—মন্দিরের নিকটে আসিয়া দেখিলেন, যবনহস্তে হস্ত রাখিয়া শক্তি তাহার সহিত একত্রে মন্দিরনির্গত হইতেছে। তিনি হতজ্ঞান হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "শক্তি, ও কে?"

শক্তি উত্তর করিল, "যুবরাজ গায়সুদ্দিন, আমার পরিণীত স্বামী।"

যোগিনী চিত্রার্পিতের ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিলেন! মুসলমান শক্তিকে লইয়া বনপথে অন্তর্হিত হইলেন।

* * * *

কিছু পরে যোগিনী নতমুখ উন্নত করিয়া পূর্ব্ব সীমান্তের নবোদিত অগ্নিময় সূর্য্য-গোলকের প্রতি একদৃষ্টে চাহিয়া সতেজে বলিলেন, "বিশ্বপতি, আমার জীবনের উদ্দেশ্য বুঝিয়াছি। এই অত্যাচার অবিচার-গ্রস্ত দেশকে উদ্ধার করাই আমার জীবনের কাজ। কেবল আমার নহে আমাদের উভয়ের জীবনের কার্য্য একই। তাহাকে প্রবৃত্তি পথ দিয়া আমাকে নিবৃত্তি পথ দিয়া, একই ব্রতানুষ্ঠানে তুমি নিয়োজিত করিতেছ। হে ভগবান্! তুমি স্রষ্টা তুমিই সৃষ্টি; তুমি জ্ঞান তুমিই মায়া; তুমি প্রবর্ত্তক তুমিই নিবর্ত্তক; তুমি কর্ম্ম তুমিই ফল, এই বুদ্ধিতে প্রবুদ্ধ করিয়া তোমার উদ্দেশ্য পূর্ণ করিবার বল আমাকে অর্পণ কর। ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ হরিঃ ওঁ!"

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

ফুল্ল বসন্তে বিহঙ্গকূজিত, মলয়হিল্লোলিত, চূতাঙ্কুরসুরভিত কাননতল প্রফুল্লমুখী রমণীগণের আনন্দবিহারে পুলকপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল! হায়! মন্দভাগ্য অশোকতরু! তুমি আজ কোথায়? তোমার পরিবর্ত্তে পেয়ারা-বৃক্ষ আজ রঙ্গিনী রমণীর চরণস্পর্শ-সুখে দোদুল্য কম্পিত হইয়া উঠিয়াছে। রমণী ক্রমশঃ অধঃ হইতে উর্দ্ধদেশের কোমলতর শাখায় উত্তরণ করিতেছেন। নীচের দর্শক নারীবৃন্দ কেহ বা অবাকনয়নে উদগ্রীব হইয়া তাহার দিকে চাহিয়া আছে; কেহ বা এক মুখে সেই আর্য্যাঙ্গনার বীর্য্যপনার ভূয়সী প্রশংসা করিতে করিতে তৎপথানুসরণে প্রয়াসী হইয়া সহস্রবার স্কন্ধমূলে পদার্পণ করিতেছেন, সহস্রবার ব্যর্থকাম হইয়া স্খলিত-পদে নামিয়া পড়িতেছেন। কোন কোন কোমলা কামিনী বা নারীজনোচিত আচারভ্রষ্টা এই পৌরুষিক রমণীর দুর্দ্ধর্ষ কাণ্ডে যুগপৎ ঘৃণা ভয় ও রোষে মুহ্যমান হইয়া কখন সক্রোধ ভর্ৎসনায় কখন অনুনয় বিনয় বাক্যে বার বার তাহাকে বৃক্ষ হইতে নামিতে অনুরোধ করিতেছেন। বীর্য্যবতী বৃক্ষারোহিণী ইহাতে আরও রণরঙ্গে মাতিয়া হাসিয়া হাসিয়া বৃক্ষ হেলাইতেছেন, শাখা দুলাইতেছেন; এবং টুপটাপ করিয়া পেয়ারা ফেলিয়া দিয়া তাহাদের রুষ্ট হৃদয় তুষ্ট করিতে চেষ্টা করিতেছেন। অন্যদিকে কুলের শিলাবৃষ্টি চলিয়াছে। কুলগাছের অদৃষ্টে পদাঘাত সুখ নাই; তাহারা কোমল হাতের ঝাঁকা খাইয়াই হৃষ্টচিত্তে দ্রৌপদীর

অশ্বের মত অনবরত ফুল বিতরণ করিতেছে, রমণীগণ তরুতল মণ্ডিত করিয়া তাহা কুড়াইয়া বেড়াইতেছেন। নবযৌবনবতী স্বামীসোহাগিনী ভামিনীগণ ইহাতে বীতলোভ, তাঁহারা এই ভাবুকতাহীন গন্ধময় আমোদের প্রতি দূর হইতে ভ্রূকুঞ্চিত নেত্রে চাহিয়া ফুলবাগানে ফুল-চয়ন করিয়া বেড়াইতেছেন। কোন কোন রমণীর আবার ফল ফুল আহরণে সুখ নাই, তাঁহাদের মনে শীকারের আমোদই জাগিতেছে। প্রেমের ফাঁদে নয়নছাঁদে যে শীকার তাঁহাদের ঘরে বাঁধা, আঁখির ফেরে তাহারা কিরূপ খেলে কিরূপ চলে, তাহা মনে পড়িয়া গিয়া সেই খেলা খেলিবার জন্য তাঁহাদের হৃদয় বড়ই ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছে—কিন্তু আপাততঃ তাহার সুবিধা না হওয়ায় টোপ বড়সিতে মাছ খেলাইয়াই তাঁহারা দুধের সাধ ঘোলে মিটাইতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন।

দুই জন রমণী এ সকল আমোদ হইতে দূরে আম্রকুঞ্জে শিলা-তলে বসিয়া মনের কথা কহিতে কহিতে পুষ্পালঙ্কার রচনা করিতেছিলেন।

আম্রকুঞ্জ সুকণ্ঠতানে শিহরিত করিয়া সহসা দূর হইতে গীতধ্বনি উঠিল—

"সইলো মকর গঙ্গাজল!
সাত রাজার ধন মাণিক আমার কোথায় আছিস বল!
সরষে ফুল হেরছি চোখে তর্ষে রেখে ছল।"

হাতের ফুল হাতে রহিল কামিনী সহসা উন্মুখ হইয়া বলিয়া উঠিল, "ঐ লো বুঝি পোড়ারমুখী আসছে!"

রঙ্গিণী সুন্দরী গাহিতে গাহিতে অবিলম্বে আম্রকুঞ্জে আসিয়া দেখা দিলেন। কুসুম বলিল, "মর তুমি, বুড়ো স্বামীর সোহাগের গান আর আমাদের শোনাতে হবে না!"

রঙ্গিণী নিকটে আসিয়া বলিল, "আচ্ছা তুই, ভাই, আমার যুবস্বামী"! বলিয়া চিবুক ধরিয়া আবার গান আরম্ভ করিল।

তুমি ধনী চাঁদবদনী, জীবন-মরণ কাটি।
ক্ষেণেক তোমার অদর্শনে, মরি লো দম ফাটি॥
তুমি আমার তালুক মুলুক, তুমি টাকার তোড়া।
তুমি চেলি বারাণসী, তুমি শালের জোড়া॥
ওলো আমার সাধের খোকা, কহি চুপে চুপে।
সদাই ভয় জাগে মনে, (তোমায়) কে নেয় কখন লুপে॥
তুমি আমার পায়েসান্ন, মিষ্টি মেঠাই ছানা।
শীতের তুমি দোলাইখানি, গরমির চিনি পানা॥
বর্ষাকালের ভরসা তুমি তালপত্রের ছাতি।
তোমায় পেলে হৃদয় ফর্সা, (ওলো) সকল ভাতির ভাতি॥
তুমি বেদ আগম পুরাণ, তুমি তর্ক যুক্তি।
তুমি আমার ভজন পূজন, সাত পুরুষের মুক্তি॥
তুমি আমার যাগযজ্ঞি, সব পুণ্যির ফল।
সকল কর্ম্মের সিদ্ধি, ওলো, দাও চরণে স্থল॥
স্বর্গসুধা সঞ্চারিত তোমার প্রেমে, প্রিয়ে।
পাপ তাপের দমন তুমি মুড়ো খ্যাংরা নিয়ে॥
হেসে হেসে কাছে এসে (ওলো) সকল দুঃখ ঘুচো।
অধীন তোমার দাসানুদাস শ্রীচরণের ছুঁচো॥

তাহার গান শেষ হইলে কামিনী কহিল, "বুড় রসের গুঁড়! একবার সোহাগ দেখনা?"

রঙ্গিণী বলিল, "তোমার কি ছোকরা নাগর গা? একটা রসের কথা ত তার মুখে এ পর্য্যন্ত শুনলুম না! অমন স্বামী আমার হলে আমি বনবাসী হতুম!"

কুসুম বলিল, "ঠাকুরজামাই আমাদের ডুবে ডুবে জল খায়। গা আর একটা গানা।"

রঙ্গিণী বলিল, "ঐ গানের পাল্‌টা শুনবি? আমাকে ভাই যমন বল্লে আমিও অমনি শুনিয়ে দিলুম!"

কামিনী। এবার থেকে তোর স্বামীর কবির দলে তুইও মিশিস।

রঙ্গিণী "যে আজ্ঞে" বলিয়া গান ধরিল।

ও প্রাণ মকর গঙ্গাজল।
খুসীর খুসী মহাখুসী, আমার সপত্নী কোন্দল॥
তুমি আমার ঘরকন্না, উনকুটি চৌষট্টি।
ধান ভানাতে ঢেঁকি তুমি, মান বানাতে বট্‌টি।
বেড়ির মুখের হাঁড়ি তুমি, তুমি খোন্তা হাতা।
মসলা পেষার সিল নোড়া, কলাই পেষার যাতা॥
হাঁড়িশালের হাঁড়ি তুমি, ঘোড়াশালের ঘোড়া।
তিন ভুবনে কোথায় মেলে তোমার একটি জোড়া॥
গো-শালেতে তুমি আমার বাঁধা কামধেনু।
আর মন মজাতে তুমি, প্রভু, বংশীধারীর বেণু॥
ভাঁড়ারঘরের ভরাভত্তি, শয়নঘরের বাতি।
ভাগ্যিবলে কভু মেলে পদ্মগন্ধের নাতি॥

বিপদ্‌কালে তুমি আমার মহাবীর হনু।
দেখা দিয়ে বাঁচাও হিয়ে, অদর্শনে মনু॥
ও প্রাণ মকর গঙ্গাজল!
ঈরিষা তিমিরা বারণ, আর, বারণ প্রেমানল॥
কাঁচা চুলের দড়ি তুমি, পাকা ধানে মই।
শীতলাভাঙ্গার তুমি আমার মুড়ি মুড়কি খই॥
ব্যান্নুণেতে লবণ তুমি, মাছের মুড়ো ঝোলে।
মোচার ঘণ্টে বড়ি তুমি, কাঁচা-আম শোলে॥
ভাপা দই তুমি সাফা, দুধের ক্ষীর চাঁচি।
তোমা নইলে কেমন করে বল প্রাণে বাঁচি?
টোপা কুলে সলপ তুমি, অরুচিতে রুচি।
তোমায় পেয়ে নিমেষেতে নয়নের জল মুছি॥
তুমি আমার, পান্তাভাতে বেগুনপোড়া, ফ্যান্‌সা ভাতে ঘি।
কেমন কোরে বল্‌ব, বঁধু, তুমি আমার কি॥
তুমি আমার জরিজরাও, তুমি পাকা কোটা।
সকল শুদ্ধির শুদ্ধি তুমি, গোবরজলের ফোটা॥
শীতের তুমি ওড়ন পাড়ন, গ্রীষ্মে জলের জালা।
বসন্তে বাহার তুমি, বর্ষাকালের নালা॥
এক মুখেতে করব তোমার কত গুণগান।
তুমি আমার বেশ বিন্যাস, স্বামীর সোহাগ মান॥
তুমি অঙ্গে অঙ্গরাগ, পানে দোক্তা চুন।
তোমায়, এক দণ্ড না পাইলে একেবারে খুন॥
যৌবনজোয়ার জলে তুমি রূপের ঢেউ।
যতন কোল্লেই রতন মেলে, (আমা বই) তোমায় পায়না কেউ।

তুমি আমার, সোণার রংয়ে জোড়া ভুরু, কাল জুলপি চুল।
থাসা নাকে ঠাসা নথ—তাহে নলক দুল॥
বাউটি তাবিজ রতনচক্র—তুমি সুগোল হাতে।
সিঁথি ঝুম্‌কো কণ্ঠহার—ধুকধুকিটি তাতে॥
মলের তুমি রুণু ঝুণু, চন্দ্রহারের থামী।
আমারূপী বোচ্‌কাবাহি, তোমায় নমি স্বামি॥

নিরুপমা সহসা পশ্চাদ্দিক হইতে বলিল, "সত্যি রঙ্গিণী এমন গায়!"

কামিনী বলিল, "ঠিক যেন শ্যামের বাঁশির মত!"

রঙ্গিণী ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "এই যে বৌরাণী!"

নিরুপমা বলিল, "তোর কিন্তু, ভাই, এই গানটা আজ রাজকুমারকে শোনাতে হবে।" যদিও গণেশদেব এখন রাজা, কিন্তু নিরুপমা তাঁহাকে আগেকার অভ্যাস অনুসারে এখনও রাজকুমারই বলে!

রঙ্গিণী বলিল, "তোমার গান আমি কেন গাব, ভাই? তুমি আজ রাজাকে এই গান গেয়ে অভ্যর্থনা করে নিও, রাজা যুদ্ধে জিতেছেন—তাঁকে ত বক্‌সিস দেওয়া চাই!"

প্রাণভরা আনন্দ ঢাকিতে গিয়া নিরুপমা একটু মোহন লজ্জার হাসি হাসিয়া বলিল, "না, ভাই, তোরা সবাই গাবি—আমি ফুলের মালা পরাব।"

কুসুম বলিল, "আমরা ত আগে তোমার গলায় পরাই—তুমি তারপর তোমার গলার থেকে খুলে রাজার গলায় পরিও।" বলিয়া হাসিয়া হাসিয়া কেহ রাণীর গলায়, কেহ তাহার হাতে,

কেহ মাথায়, ফুলের গহনা পরাইতে পরাইতে তিনজনে মিলিয়া গান ধরিল—

প্রাণ সই লো সই!
শোন্ তোমারে কই—
আমি জানিনে যে তোমা বই।

নিরুপমা গাহিল—

রাখ চতুরালি, শঠ বনমালি,
দুখিনী রাধে আমি চন্দ্রাবলী নই,—

সখীরা গাহিল—

ছি ছি ছি প্যারী, মিছে মানচাতুরী,
হের—হৃদ্সাগরে পিরীত-নীরে নাহি মানে থৈ।
দিয়ে চরণ-তরী, রাইকিশোরি,
রাখ যদি তবেই রই!"

তাহাদের গান শেষ না হইতে হইতে নিরুপমা বলিল,—"না, ভাই, এ মালা পরান হ'বে না,—আমি আজ নিজে মালা গেঁথে তাঁর গলায় পরাব,—ঐ তো অনেক ফুল আছে, আমি গাঁথি।" এই বলিয়া নিরুপমা শিলাতলে মালা গাঁথিতে বসিল।

সূঁচে ফুল পরাইতে পরাইতে সহসা তাহার প্রফুল্ল মুখখানি কেমন বিষণ্নতায় মলিন হইয়া পড়িল,—তাহার সেই পুরাতন দিনের কথা মনে পড়িয়া গেল। তাহার মনে হইল, শক্তি আসিয়া সহসা যদি সেই পুরাতন দিনের মত তাহার হাতের মালাগাছটি কাড়িয়া রাজার গলায় পরাইয়া দেয়! সভয়ে সে উন্মুখ হইয়া চাহিল, শক্তিকে না দেখিয়া নিশ্চিন্তভাবে দীর্ঘনিশ্বাস

ফেলিয়া আবার মালা গাঁথিতে লাগিল, এই সময় দূরে বাঁশরী ধ্বনিত হইল। কামিনী বলিয়া উঠিল,

"ওগো শোন! সেই পুরাণ গান!

আমি কি চাহি,

সে আমার, আমি তার, আমার কি নাহি।

অনেকদিন এ সুর শুনিনি! আমার ছেলেবেলার কথা মনে পড়ছে। মনে আছে বৌরাণি, সেই পুরাণ দিনের কথা! সেই রাজারাণী খেলা!"

মনে আবার নাই! সেই স্মৃতি নিরুপমার এই সুখের দিবালোকও ম্লান করিয়া আছে, আর মনে নাই!

নিরুপমা মুখ না তুলিয়াই আস্তে আস্তে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল—"রাজকুমার আজ যে এখনও এলেন না!"

রাজকুমার তখন সেই নিস্তব্ধ নদীতীরে মধুর অপরাহ্নে তাঁহার বাল্যসঙ্গী, খেলার রাণী, শক্তিময়ীর মধুর রূপে নয়ন ভরিয়া, হৃদয় প্রাণ তাহাতে মগ্ন করিয়া দিয়া, তাঁহার পুরাতন প্রেমগীতি আবার নূতন করিয়া গাহিতেছিলেন, তিনি এখন এখানে আসিবেন কেমন করিয়া? তিনি এখন জগৎ সংসার ভুলিয়াছেন, আপনাকে ভুলিয়াছেন, নিরুপমাকে পর্য্যন্ত ভুলিয়াছেন। তিনি এখন বঙ্গপূর্ব্বের হারান বালক গণেশদেবে এবং কুমরাণী বালিকা শক্তিতে মাত্র জাগ্রত, তন্ময়, আত্মহারা; আর সমস্তই এখন তাঁহার নিকট শূন্য, অস্তিত্ববিহীন।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

রাজকুমারের সেদিন প্রমোদ উদ্যানে গিয়া ক্রীড়াকৌতুক করিবার দিন নহে। নিস্তব্ধ রাত্রিতে গৃহে আসিয়া তারকাখচিত গগণদেশের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া রাজকুমার একাকী বারান্দায় বসিয়া আছেন। তাঁহার মস্তিষ্ক চিন্তালোড়িত, হৃদয় বেদনাপূর্ণ, তাঁহার মনে হইতেছে "কি করিলাম!—কি করিলে ঠিক হইত! ভগবান, কি অপরাধে আমা হইতে তাহার এই দশা ঘটাইলে! এত ভালবাসার এই পুরস্কার! কি করিলাম—হায়, কি করিলাম!"

নিরূপমা সহসা পশ্চাদ্দিক হইতে আসিয়া তাঁহার চোক টিপিয়া ধরিল। রাজকুমার চমকিয়া অন্যমনে বলিয়া উঠিলেন, "শক্তি!" নিরূপমার বক্ষ কাঁপিয়া উঠিল, থতমত খাইয়া সে বলিল, "আমি—নিরূপমা!" রাজকুমার তাহার দিকে চাহিয়া বলিলেন, "নিরূপমা! বস।" তাঁহার কথায়, তাঁহার ভাবে নিরূপমা অন্য দিনের প্রেমাগ্রহের অভাব অনুভব করিল, পাখীর বুলির মত তাহা যেন তাঁহার অভ্যস্ত সম্ভাষণবাক্য মাত্র। নিরূপমার চক্ষু জলপূর্ণ হইয়া উঠিল, সে না বসিয়া নিস্তব্ধে দাঁড়াইয়া রহিল। নিরূপমা এখন পঞ্চদশবর্ষীয়া, কিন্তু সরলতাপূর্ণ নির্ভরভাবে নিরূপমা এখনও ক্ষুদ্র শিশু, তাহার যৌবনোদ্দীপ্ত হৃদয়ভরা প্রেম সেই আত্মনগণ্য সভয় সঙ্কোচভাবে মিলিত হইয়া এখনও শৈশব-কোমল, স্নিগ্ধভাস, নবীনমধুর।

কিছুক্ষণ পরে রাজকুমারের হুঁস হইল নিরূপমা না বসিয়া

দাঁড়াইয়া আছে। আতিথ্যের ত্রুটি হইলে অতিথিবৎসলের যেরূপ মনোভাব হয়, রাজকুমার সেই ভাবে অনুতপ্ত হইয়া তাহার হাত ধরিয়া ধীরে ধীরে নিকটে মর্ম্মর চৌপায়ার উপর তাহাকে বসাইলেন, নিরুপমা বসিয়া তাঁহার স্কন্ধের উপর মুখ রাখিয়া কাঁদিতে লাগিল। রাজকুমার নিজের ব্যথা গোপন করিয়া তাহাকে শান্ত করিবার ইচ্ছায় তাহার গলদেশে বাহু বেষ্টন করিয়া সস্নেহে বলিলেন,"কি হইয়াছে, নিরুপমা ?" নিরুপমা কোন উত্তর করিল না। রাজকুমার অনেকক্ষণ ধরিয়া জিজ্ঞাসা করিতে করিতে সে তাহার অশ্রুপূর্ণ দৃষ্টি তাঁহার দৃষ্টিতে স্থাপিত করিয়া বলিল, "রাজকুমার, বল তুমি আমাকে ভালবাস ?"

তিনি তাহার অলক গুচ্ছ নাড়াইয়া বলিলেন,"একশ বার কি ঐ কথা বলতে হয় নাকি ?"

নিরুপমা আধ বাধ স্বরে বলিল, "তুমি যদি—তুমি যদি—"

রাজকুমার তাহার কম্পিত অধরে চুম্বন করিলেন। সে তাঁহার গলা ধরিয়া বলিল, "আমার মনে হয় শক্তি যদি আসে ত তুমি আমাকে ভুলে যাবে।" রাজকুমার সে কথার কোন উত্তর না করিয়া সেই সরলা সাশ্রুনয়নার দিকে চাহিয়া রহিলেন। সে বলিল, "বল ভুলবে না ? বল তুমি আমার!"

রাজকুমার বলিলেন, "তোমার নয় ত কার ?" সে বলিল, "জানিনে কার! কিন্তু আমার বড় কষ্ট হচ্চে!" বলিয়া তাঁহার কোলে মাথা লুকাইয়া সে কাঁদিতে লাগিল। রাজকুমার সেই রোরুদ্যমানা প্রেমময়ী পত্নীর মস্তক ক্রোড়ে করিয়া দারুণ যন্ত্রণাপূর্ণ হৃদয়ে নীরব হইয়া রহিলেন। একদিকে শক্তিকে বিবাহ করিয়া আনিলে নিরুপমার মত কোমল লতিকার হৃদয় দলিত

করিতে হয়—অন্যদিকে শক্তিকে বিবাহ না করিলে তাহার ধর্ম্ম নষ্ট হয়, যে তাঁহাকে পতিরূপে বরণ করিয়াছে, তাহাকে বাধ্য হইয়া অন্যের পাণিগ্রহণ করিতে হয়। তিনি এখন কি করিবেন?

রাজকুমার উক্তরূপ সমস্যার মধ্যে পড়িয়া দুশ্চিন্তাপূর্ণ হৃদয়ে অনিদ্রায় রাত্রি অতিবাহিত করিলেন। রাত্রি প্রভাত হইতেই নল রাজার ন্যায় নিদ্রাতুরা পত্নীর পার্শ্ব ত্যাগ করিয়া শক্তির অন্বেষণে বাটীর বাহির হইলেন। অভিপ্রায়, শক্তির সহিত একবার দেখা করিয়া যাহা হয় শেষ মীমাংসা করিবেন। কিন্তু তাহার আর আবশ্যক হইল না; বনপথ অতিক্রম না করিতে করিতেই বাদ্যরব শ্রুত হইল। তিনি রাজপথে পড়িয়া দেখিলেন অশ্বারোহী পদাতিক সৈন্য সামন্তে এবং উৎসুক গ্রামবাসীর সমাগমে চারিদিক পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। একজন রাজপুরুষ ঢাক পিটিয়া বলিতেছে, "নবাব গায়সুদ্দিন রাজবিদ্রোহী। সুলতান শাহের আজ্ঞায় তাঁহার বিরুদ্ধে যুদ্ধে যাইতেছি—কে সৈনিক হইবে আইস।"

রাজকুমার একজন অশ্বারোহীর নিকটে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "নবাব শাহ কি দোষ করিয়াছেন?" উত্তর হইল—"কাল যে হিন্দুকন্যাকে উৎসবপ্রাঙ্গণে দেখিয়াছিলেন তাহার সহিত বাদসাহের সম্বন্ধ স্থির করিতে গিয়া নবাব শা নিজে তাঁহার পাণিগ্রহণ করিয়াছেন।" রাজকুমার বজ্রাঘাতে যেন স্তম্ভিত হইয়া পড়িলেন।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

রমণীকণ্ঠে সহসা নিজের নাম উচ্চারিত হইতে শুনিয়া গণেশ-দেবের মোহ ভঙ্গ হইল। রমণী কাতরতাপূর্ণ রুদ্ধস্বরে কহিতেছিল "এ কাহাকে দেখিতেছি? মহারাজ গণেশদেব না? তাঁহার সম্মুখে এই অবিচার, এই অত্যাচার, স্ত্রীলোকের এরূপ অবমাননা, আর তিনি প্রস্তর-মূর্ত্তির ন্যায় দাঁড়াইয়া? মহারাজ, ধিক্ তোমাকে ধিক্! তোমরাই বঙ্গমাতার কুলোজ্জ্বল সন্তান! তাই অভাগিনী জন্মভূমির এত দুর্দ্দশা!"

গণেশদেব বিস্মিতভাবে সেই স্বর লক্ষ্যে দৃষ্টিপাত করিয়া অনতিদূরে প্রহরীবেষ্টিতা বদ্ধহস্তা সন্ন্যাসিনীকে দেখিতে পাইলেন। তখন সচকিতে নিকটে আসিয়া সৈনিকদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ইনি কে? ইঁহাকে বাঁধিয়াছ কেন?" সৈনিকগণ তাঁহাকে অভিবাদন করিল। একজন উত্তর করিল, "বন্দেগি হুজুর, ফৌজদার সাহেব বাদশাহকে জানাইলেন মায়িজির ঘর হইতে নবাবশাহ বেগম লুট করিয়াছেন, বাদশাহের হুকুম হইল মায়িজিকে বাঁধ! আমরা হুকুম তামিল করিয়াছি।"

যোগিনী একটু হাসিয়া কহিলেন—"একজন করিল চুরী, আর এক জনের ফাঁসি! ইহাই সুবিচার বটে!"

গণেশদেব কটির তরবারি কোষমুক্ত করিয়া হস্তে ধরিয়া বলিলেন, "তোমরা সব সর, পথ দাও"। সৈনিকগণ তাঁহার মতলব বুঝিয়া বলিল, "দোহাই মহারাজ! উঁহাকে ছাড়াইয়া লইবেন

না, তাহা হইলে আমরা গরীব বেচারারা মারা যাইব ; ফৌজদার সাহেব আমাদের উপর খাপ্পা হইবেন।" এইরূপ বলিতে বলিতে তাঁহার তীক্ষ্ণধার রৌদ্রচমকিত স্বচ্ছ অসি-ফলার স্পর্শ হইতে তাহারা সরিয়া দাঁড়াইল, গণেশদেব সন্ন্যাসিনীর নিকটস্থ হইয়া তাঁহাকে রজ্জুমুক্ত করিতে করিতে বলিলেন, "তোমরা ভয় পাইও না। আমি সেনাপতিকে বলিব তোমাদের কোন দোষ নাই। যদি সেনাপতি তথাপি তোমাদের দণ্ডনীয় বিবেচনা করেন, তবে আমার নিকট আসিও, আমার সৈন্যদল ভুক্ত হইবে। সেনাপতি কোথায় ?"

সৈনিক বলিল—"আমাদের উপর হুকুম জারি করিয়া তিনি আপনার কুঠিতে গেছেন।"

ঢাকের বাজনা থামিল—এ দিকে গোলযোগ শুনিয়া কৌতুহলাকৃষ্ট দর্শকগণ সৈনিকদিগের গায়ের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িতে লাগিল। গণেশদেব অসির আস্ফালনে জনতা ছিন্ন করিয়া মুক্ত সন্ন্যাসিনীকে কহিলেন, "আমার অনুসরণ করুন, সৈনিকেরা কেহ আর তাহা হইলে আপনাকে বাধা দিতে সাহস করিবে না।"

সন্ন্যাসিনী বলিলেন, "জানি, বৎস, তুমি থাকিতে আর কোন ভয় নাই। কিন্তু আমি পথ ধরি তুমি আমার সঙ্গে সঙ্গে এস ; এখানকার পথ ঘাট আমি বেশ জানি।"

দর্শকবৃন্দ অবাক হইয়া রহিল, সৈনিকেরা কেহ হস্তোত্তোলন করিতে সাহস করিল না। গণেশদেব সন্ন্যাসিনীর সহিত বনপথে অদৃশ্য হইয়া গেলেন।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

কিছুদূর আসিয়া সন্ন্যাসিনী বলিলেন, "ডাইনে ঘুরিলেই তোমার বাড়ীর উদ্যান-সীমানা, তুমি গৃহে যাও আমি একটু পরে যাইতেছি।"

গণেশদেব বাটীর নিকটস্থ হইয়া আজিমখাঁকে দেখিতে পাইলেন। তাঁহাকে দেখিয়া আজিম খাঁ বলিল, "এই যে মহা-রাজ! আমি আপনার নিকট আসিয়াছি, জরুরী খবর! পিতা পুত্রে বিবাদ বাধিয়াছে যুদ্ধ সজ্জা করুন, পুত্রের বিরুদ্ধে যাত্রা করিতে হইবে।"

গণেশদেব সে কথার কোন উত্তর না করিয়া কহিলেন, "সেনাপতি এ কি ব্যাপার! নিরাপরাধে সন্ন্যাসিনীকে বন্দী করিয়াছেন কেন?"

আজিম খাঁ বলিলেন, "বাদশাহের হুকুম। ঔরতের বদলে ঔরৎ চান। গোলাপ না মিলিলে চামেলিই ভাল।" গণেশদেব বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "আজিম খাঁ! স্ত্রীলোক ঠাট্টা তামাসার বিষয় নহে। যাঁহারি হুকুম হউক আমি সন্ন্যাসিনীকে মুক্তি দিয়াছি।"

"মুক্তি দিয়াছেন!—সে কি?"

"বন্ধন মোচন করিয়াছি।"

"তবু ভাল, ছাড়িয়াত দেন নাই?"

"হ্যাঁ, তাই। তা না হলে আর বন্ধন মোচনের ফল কি?"

"ছাড়িয়া দিয়াছেন—বলেন কি ? পলাইতে দেন নাই ত?"

"যদি পলাইতে না দিলাম তবে আর ছাড়িয়া দিলাম কি ?"

"আপনি তামাসা করিতেছেন। পলাইবে কি ? আমি যে সৈনিকদের পাহারায় রাখিয়া আসিয়াছি।"

"সৈনিকদের দোষ নাই ; আমি বলপূর্ব্বক তাঁহাকে মুক্ত করিয়া, সঙ্গে করিয়া নিরাপদ স্থানে ছাড়িয়া দিয়াছি।"

আজিম খাঁ হতজ্ঞান হইয়া বলিল—"করিলেন কি ! বাদসাহ যে ফকিরাণীর মুখে সমস্ত খবর জানিতে চাহেন। মহারাজ, তাহাকে কোথায় রাখিয়াছেন বলুন ? নহিলে আপনি রাজ-বিদ্রোহী বলিয়া গণ্য হইবেন।"

গণেশদেব বলিলেন—"রাজা অন্যায় হুকুম করিলে তাহার লঙ্ঘন বিদ্রোহিতা নহে। বাদসাহকে বলিবেন—আমার পিতা-মহ তাঁহার পিতার যে উপকার করেন তাহার বিনিময়ে আমি সন্ন্যাসিনীর মুক্তি ভিক্ষা করিতেছি।"

আজিম খাঁ বলিল—"দেখুন, মহারাজ, আপনি দেখিতেছি নিতান্ত দুগ্ধপোষ্য। যখন কাহাকেও শত্রু করা আবশ্যক বিবেচনা করিবেন, তখন তাহাকে আপনার পূর্ব্বকৃত উপকার স্মরণ করাইয়া দিবেন। যদি এস্থলে আপনার সে অভিপ্রায় না থাকে তবে বিনা বাক্যব্যয়ে সন্ন্যাসিনীকে ফিরাইয়া দিন।"

গণেশ। তাহা দিব না। আপনি ত পুরুষ—আপনি বলুন দেখি, শরণাগত স্ত্রীলোকের রক্ষার জন্য বাদসাহের ক্রোধ আপনি উপেক্ষা করিতেন কি না ?

আজিম। তবে তাহাই হউক। কিন্তু জানিয়া রাখুন ; এখনি বন্দী করিতে আসিব। সয়তান এখন বাদসাহকে পাইয়া

বসিয়াছে। তাঁহার এখন উপকার স্মরণ করিবার সময় নহে।"

গণেশদেব বলিলেন—"আপনিও জানিয়া রাখুন—সন্ন্যাসিনীর মুক্তি আজ্ঞা না পাইলে আমিও বাদসাহের সামন্ত নহি।"

আজিম খাঁ চলিয়া গেল। মহারাজ বাটী অভিমুখে অগ্রসর হইতেছেন, সন্ন্যাসিনী আসিয়া বলিলেন—"এখানে আর নহে, বিলম্ব হইলেই শত্রুপক্ষ আমাদিগকে বন্দী করিবে। আমি তোমার সৈন্যসামন্তকে প্রস্তুত হইতে বলিয়াছি—তুমি তাহাদিগকে এবং পরিবারস্থ সকলকে সঙ্গে লইয়া অবিলম্বে আমার অনুবর্ত্তী হও। যুদ্ধ করিতেই হইবে, কিন্তু সে জন্য নিরাপদ স্থানে শিবির সংস্থাপন আবশ্যক।"

অতি অল্প সময়ের মধ্যে গণেশদেব সপরিবারে সৈন্য-সামন্ত লইয়া পাণ্ডুয়া নিবাস ত্যাগ করিলেন। অন্নোৎসব উপলক্ষে এই স্থানে তিনি সপরিবারে আসিয়াছিলেন। আজিম খাঁ বাদসাহের আজ্ঞায় তাঁহাকে বন্দী করিতে আসিয়া দেখিলেন বাটী জনশূন্য।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

সমরানল প্রজ্বলিত হইল। একে বাদসাহ পুত্রের বিশ্বাসঘাতকতায় ব্যর্থ-মনোরথ হইয়া ক্রোধান্ধ হইয়া আছেন, ইহার উপর সন্ন্যাসিনীর মুক্তিসংবাদ শুনিয়া একেবারে আগুণ হইয়া বলিয়া উঠিলেন, "অপমানের উপর অপমান! আগে হইতে সন্ন্যাসিনীকে মুক্তি দিয়া আবার আমার নিকট তাঁহার মুক্তির প্রস্তাব! এ প্রস্তাব আমার কাছে লইয়া আসিবার আগেই রাজবিদ্রোহী বলিয়া তাহাকে বন্দী করা উচিত ছিল। সেনাপতি, তুমি অপরাধী!"

সেনাপতি সসঙ্কোচে বলিল—"জাঁহাপনা, ভৃত্যের কসুর হইয়াছে সন্দেহ নাই। কিন্তু এখন সময় বড় খারাপ—নবাব-সাহের সহিত যুদ্ধ করিতে হইতেছে। গণেশদেবকে বন্দী করিতে হইলে তাঁহার সহিতও যুদ্ধ করিতে হয়, সহজে কিছু তাঁহাকে বন্দী করা যাইবে না। এইরূপে বলক্ষয় করিলে আমাদেরই ক্ষতির সম্ভাবনা। তাহা অপেক্ষা গণেশদেব যদি আমাদের সহায় হন—তবে সহজেই আমরা শত্রু দমন করিতে পারিব।"

চোরা না শোনে ধর্ম্মের কাহিনী! বাদশাহ রাগিয়া বলিলেন, —"আজিম খাঁ! গণেশদেব নহিলে তোমরা শত্রু দমন করিতে পারিবে না, সেই জন্য গণেশের বিদ্রোহিতাকে প্রশ্রয় দিতে হইবে—তুমি কি এই কথা বলিতে চাও?"

আজিম খাঁ বলিল—"জাঁহাপনা, তাহা বলিতেছি না। আপনার হুকুমের জন্য মাত্র অপেক্ষা করিতেছি।"

বাদসাহ বলিলেন—“আমার হুকুম তাহাকে বন্দী করিয়া আন।”

আজিম খাঁ তাঁহার হুকুম তামিল করিতে গিয়া গণেশদেবের বাটি শূন্য দেখিয়া ফিরিয়া আসিতেছেন, পথিমধ্যে গায়সুদ্দিনের সৈন্যগণের সহিত সাক্ষাৎ হওয়াতে তাহাদিগকে আক্রমণ করিলেন।

যুদ্ধ আরম্ভ হইল। উভয় পক্ষের কতক গুলা সৈন্যক্ষয়ের পর সন্ধ্যা বেলা গায়সুদ্দিন বনমধ্যে অদৃশ্য হইলেন। বাদশাহের হুকুমে পরদিন হইতে বনমধ্যে স্থানে স্থানে সৈন্য প্রেরিত হইল। বনমধ্যে তাঁহার আর এক শত্রু গণেশদেবও শিবির স্থাপন করিলেন। দিনাজপুর এবং অন্যান্য স্থান হইতে সৈন্য সংগৃহীত হইয়া প্রতিদিন তাঁহার শিবির পূর্ণ হইতে লাগিল। একদিকে গায়সুদ্দিন অন্য দিকে গণেশদেবের সহিত বাদসাহের সংগ্রাম চলিতে লাগিল।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

অভ্যোৎসবের দিন সন্ধ্যাবেলা সুলতান সেকন্দরসাহ সেনাপতি আজিমখাঁকে উদ্যাননিভৃতে ডাকিয়া শক্তির সন্ধানে নিযুক্ত করিতেছিলেন। গায়সুদ্দিন পিতার নিকট রাত্রির জন্য বিদায় লইতে এইদিকে আসিয়া তাঁহাদের গুপ্ত কথোপকথন শুনিতে পাইলেন—শুনিয়া হতজ্ঞান হইলেন। অবশেষে কি না পিতা

পুত্রে তাঁহারা প্রতিদ্বন্দ্বী! এ দ্বন্দ্বে প্রবৃত্ত হইতে গেলে ঐশ্বর্য্য সম্পদ রাজ্য জীবন সকলই পণ করিয়া তবে তাঁহাকে আগুয়ান হইতে হয়। তিনি কি করিবেন? মরিবেন—না ফিরিবেন? এ প্রশ্নের উত্তরে তাঁহার পরামর্শদায়িনী প্রাণসখী উগ্রবাসনাময়ী প্রবৃত্তি অন্তর হইতে সদর্পে, সতেজে বলিয়া উঠিল, "ছি ছি! ফিরিবে কি! মরিতে হয় মরিও—কিন্তু ফিরিও না!" গায়সুদ্দিন কখনও তাহার কথা অগ্রাহ্য করেন নাই, আজও পারিলেন না—জানিয়া শুনিয়া নিশ্চিং বিপদের মুখে অগ্রসর হইতে সঙ্কল্প করিলেন।

নবাব সাহ গায়সুদ্দিন আজিম খাঁ সুবর্ণগ্রামের শাসনকর্ত্তা। সেইখানেই তিনি বাস করেন,—অস্ত্রোৎসব উপলক্ষে রাজধানীতে সম্প্রতি আসিয়াছিলেন মাত্র। সুবর্ণগ্রামে তাঁহার একাধিপত্য,—তাঁহার নামে সেখানে মুদ্রার পর্য্যন্ত প্রচলন হইয়া থাকে। বাদসাহ ইহাতে কোন আপত্তি করেন না। তিনি মনে করেন, গায়সুদ্দিনই ত ভবিষ্যতে তাঁহার সিংহাসনে বসিবেন,—না হয় পিতা বর্ত্তমানেই পুত্র নিজের এলাকায় রাজপ্রতাপ বিস্তার করিলেন;—তাহাতে আর সুলতানের ক্ষতি কি! ক্ষতি যে কি তাহা এইবার বুঝিতে পারিলেন।

গায়সুদ্দিন পিতার গুপ্ত পরামর্শ শুনিতে পাইয়া আর তখন তাঁহার সহিত দেখা করিলেন না—চুপে চুপে স্বভবনে ফিরিয়া সুবর্ণগ্রামে ফিরিবার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। কতক সৈন্যসামন্ত সঙ্গে পরিবারদিগকে সেই রাত্রেই সেখানে রওয়ানা করিয়া দিলেন—বাকী সৈন্য নিজের সঙ্গে লইবার জন্য সজ্জিত রাখিয়া কুতবের জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। কুতব তাঁহার

আর এক প্রিয় বন্ধু, প্রবৃত্তি তাঁহাকে যে পরামর্শ প্রদান করে—কুতব দ্বারা অনুমোদিত হইয়া তাহা কার্য্যে পরিণত হয়। একজন যেন তাঁহার জীবন ঘড়ির কাঁটা, আর একজন তাহাতে দম দিবার হাত; উভয়ের কাহাকেও নহিলে তাঁহার চলে না। শক্তিকে দেখিবামাত্র প্রবৃত্তি যেমন তাঁহাকে উত্তেজিত করিল,—কুতব অমনি ইঙ্গিতে তাঁহার বাসনা বুঝিয়া তৎক্ষণাৎ বালিকার অনুগামী হইল। কুতব যে কৃতকার্য্য হইয়া ফিরিবে সে বিষয়ে নবাবের কোন সন্দেহ নাই। তিনি কেবল কুতবের প্রত্যাগমন পথ চাহিয়া উৎকণ্ঠিতচিত্তে মুহূর্ত্ত গণনা করিতেছেন। একবার শক্তিকে লইয়া নিজের এলাকায় পৌছিতে পারিলে আত্মরক্ষা করা তাঁহার পক্ষে তখন অপেক্ষাকৃত সহজ হইবে। রাত্রি দ্বিপ্রহরের কিছু পরে কুতব আসিয়া নবাবসাহেবকে খবর দিল, "হরিণী জালে পড়িয়াছে—সেজন্য আর ভাবনা নাই, এখন কেবল তাহাকে উদ্ধার করিয়া আনিলেই হয়।" নবাবসাহেব উৎফুল্লহৃদয়ে তখন তাঁহার পালায় ইতিমধ্যে ঘটিত সমস্ত ঘটনা আনুপূর্ব্বিক তাহাকে বলিলেন। কুতব তাঁহার ক্রিয়াকলাপ সময়োপযুক্ত হইয়াছে বিবেচনা করিয়া তাহার তারিফ করিল। গায়সুদ্দিন নিশ্চিন্ত হইয়া আর একটি বিপদ কিরূপে ভঞ্জন হইতে পারে তাহার পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিলেন।

নবাবের ইচ্ছা পলায়নের পূর্ব্বেই শক্তিকে বিবাহ করিয়া রাজ-প্রথানুযায়ী সম্মানে তাহাকে বধূরূপে গ্রহণ করেন, এজন্য অন্য কোন বাধা নাই কেবল প্রাসাদের মাত্র অভাব,—যেখানে বালিকাকে বেগমবেশে সাজাইয়া উপযুক্তরূপ সমাদর করিতে পারেন। ইহার কি উপায় করা যায়?

নবাবের মস্তকের উপর খরধার উন্মুক্ত খড়্গা, তাহা হইতে

দূরে না যাইতে পারিলে নিশ্চয় মৃত্যু! কিন্তু এই আসন্ন মহা-বিপদ উপেক্ষা করিয়াও তিনি এখন তাঁহার খেলার পরিতৃপ্তির জন্য ব্যস্ত! এমনই মোহের খেলা! ভোগসুখের মায়া! শুনিতে আশ্চর্য্য বটে, কিন্তু এরূপ আশ্চর্য্য সংসারে নিতান্ত বিরল নহে।

কুতব এ কার্য্য কিছুই কঠিন দেখিল না। কুতবের পিতা রাজমন্ত্রীর সুসজ্জিত নির্জ্জন উদ্যানবাটীকা ইহার জন্য সে উপ-যোগী বিবেচনা করিয়া উদ্যানরক্ষককে এক পত্র লিখিয়া দিল। সেই পত্র লইয়া সৈন্যাধ্যক্ষ হোসেন খাঁ পরিচারিকা-পূর্ণ দুইখানি শিবিকা, এবং অবশিষ্ট সেনা সঙ্গে তৎপথাভিমুখে যাত্রা করিল; আর নবাবসাহ একখানি শিবিকা এবং দুই চারিজন বাছা বাছা সৈন্য মাত্র লইয়া কুতবের সঙ্গ গ্রহণ করিলেন কালীমন্দিরের কাছে পৌছিয়া কুতবের আদেশে সৈন্যগণ শিবিকা লইয়া বন মধ্যে লুকাইল—তাঁহারা দুই বন্ধুতে মন্দিরে প্রবেশ করিলেন। ইতিপূর্ব্বেই কুতব শক্তির অনুসরণ করিয়া মন্দিরের আশপাশ, মন্দিরের অভ্যন্তর, সব দেখিয়া গিয়াছিল। সে মন্দিরে ঢুকিয়া প্রথমেই পরিচ্ছদ পরিবর্ত্তন করিল, মাথার উষ্ণীষ পরিচ্ছদীয়রূপে ধারণ করিয়া কালীকণ্ঠের জবা-হার লইয়া মাথায় জড়াইল, বক্ষে ঝুলাইল—দেয়াল হইতে নৃকপালমালিকা লইয়া গলায় পরিল; প্রতিমার সম্মুখস্থিত পাত্র হইতে রক্তচন্দন লইয়া অনাবৃত গাত্রের যেখানে সেখানে দিল। এইরূপে সাজসজ্জা করিয়া নবাবশাহকে বলিল,—"দাঁড়ান্—এইবার দেখা যাক ইহার পর কি করিতে হইবে?" এই বলিয়া দেয়ালের ছিদ্র দিয়া সন্ন্যাসিনীর গৃহাভ্যন্তরে দৃষ্টিপাত করিয়া কিছুক্ষণ পরেই বলিয়া উঠিল, "নবাবসাহ, প্রতিমার পশ্চাতে লুক্কায়িত থাকুন; বালিকা এইখানেই

আসিবে।" উভয়েই প্রতিমার পশ্চাতে লুক্কায়িত হইলেন। যথাসময়ে পরিবর্ত্তিত কণ্ঠে কুতব শক্তির কথার উত্তর প্রদান করিল, তাহার পর কি হইল পাঠক তাহা জানেন।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

ঐশ্বর্য্যের আলোকরাজ্যে নীত হইয়া শক্তির চক্ষু সহসা ঝলসিয়া উঠিল। কিন্তু সে কেবল মুহূর্ত্তের জন্য; তাহার পর পলক-পাতেই যেন সেই আলোক-তেজে তাহার নয়ন অভ্যস্ত হইয়া আসিল। মহারাণী হইতেই সে জন্মিয়াছে, মহারাণীই সে হইল,—ইহাতে আর বিস্ময়ের কি আছে!

মুকুরশোভিত গৃহ, চারিদিকে দর্পণের দেয়াল। দর্পণের কাছে কাছে লতা-পাতা-ফুল বেষ্টিত সুকোমল শয্যাসন। গৃহের যত্র তত্র ফুলে ফুলে সজ্জিত শ্বেতমর্ম্মরময় উৎস, উৎস হইতে গোলাপ জলের ফোয়ারা ছুটিতেছে, তাহার সুগন্ধ পুষ্পোত্থিত সুবাসে মিলিয়া গৃহ সুগন্ধাকুল করিয়া তুলিয়াছে। বহুমূল্য বস্ত্রালঙ্কারভূষিতা সুন্দরী সখিগণ পরিবৃতা হইয়া শক্তি যেমন এই গৃহে আসিয়া দাঁড়াইল, অমনি শতসহস্র সুসজ্জিতা সুন্দরী, শত শত উৎসারিত ফুল্ল কানন পূর্ণ করিয়া তাহাকে যেন ঘেরিয়া দাঁড়াইল! শক্তি চমকিয়া উঠিল! তাহার অভ্যর্থনার জন্য নন্দন কানন মর্ত্ত্যে নামিয়া আসিয়াছে না কি?

শক্তি সবিস্ময়ে আবার ভাল করিয়া চারিদিকে চাহিয়া দেখিল। সেই কুঞ্জ কাননে সালঙ্কৃতা সুসজ্জিতা অপ্সরাদিগের মধ্যে এক দীনবেশা রমণী শতমূর্ত্তিতে বিরাজমানা। শক্তি আপনাকে চিনিয়া আশ্বস্ত হইল—বুঝিল ইহা মায়ার খেলা, দর্পণবিম্বিত দৃশ্য! বিস্ময়ের পরিবর্ত্তে তখন অপূর্ব্ব গর্ব্বময় পরিতৃপ্তিতে তাহার হৃদয় ভরিয়া উঠিল, এই সামান্য দীনবেশার মনস্তুষ্টির জন্যই কি এত অসামান্য আয়োজন! লক্ষ লক্ষ নরনারীর এখন সে কর্ত্রী! তাহার ইঙ্গিতে, তাহার আদেশে, তাহারা জীবনপাত করিতেও কুণ্ঠিত হইবে না! সে এখন সামান্য দরিদ্র রমণী মাত্র নহে!

শক্তি সেখান হইতে স্নানাগারে নীত হইল। চারিজন দাসী ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের মণিমুক্তা-হীরক-খচিত চারিটি পেশোয়াজ তাহার সম্মুখে ধরিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "বেগমসাহেব, ইহার কোনটি স্নানান্তে পরিবেন?" শক্তি একে একে সে গুলি একবার নাড়াচাড়া করিয়া বলিল, "এ কি বিশ্রী, অন্য কাপড় নাই?" দাসীরা অবাক হইয়া গেল। একজন বলিল, "বিশ্রী! এই কাপড়ের জন্য তিন বেগমের মুখ দেখাদেখি নাই!" আর একজন বলিল, "ইহা নবাবসাহেবের মাতা সুলতানা সাহেবের পরিচ্ছদ, তাঁহার মৃত্যুর পর তিন বেগমেই ইহা দখল করিতে চাহেন, নবাবসাহ তাই কাহাকেও না দিয়া তুলিয়া রাখিয়াছিলেন, আজ আপনার অঙ্গশোভার জন্য ইহা প্রেরিত হইয়াছে!"

শক্তি একটু হাসিয়া বলিল, "ইহাতে আমার আবশ্যক নাই, নূতন বেগমের উপহার বলিয়া তিনজনকে ইহার তিনটি পাঠাইয়া দাও।"

"আর একটি?"

"আর একটি? নবাবসাহের এতদিন প্রিয় বেগম কে ছিল?

"মতিয়াজান!"

"এটি তাঁহাকেই পাঠাইয়া দাও।"

দাসী বলিল, "যো হুকুম! কিন্তু আপনি কি পরিবেন?"

"সাড়ি নাই? আমার একখানি সাড়ি ও ওড়না হইলেই হইবে!"

দাসী পরিচ্ছদপেটিকা খুলিয়া তাহা হইতে নানা বর্ণের, নানা কারুকার্য্যের, নানা রকমের সাড়ি ও ওড়না বাহির করিতে লাগিল। শক্তি তাহার মধ্য হইতে হীরকপাড়-সংযুক্ত একখানি শুভ্র বস্ত্র ও স্বর্ণখচিত একখানি ওড়না বাছিয়া লইল।

স্নানান্তে সেই বস্ত্র পরিধান করিয়া শক্তি কোমল শয্যায় ক্লান্তিজনক আয়েসে ঠেসান দিয়া বসিয়া আছে। সখীগণ কেহ তাহার চুল শুকাইতেছে; কেহ ব্যজন করিতেছে; কেহ চরণতল মেদিরঞ্জিত করিতেছে; কেহ আতর গোলাপ মাখাইতেছে; আর দুইজন গহনার বাক্স হইতে অলঙ্কার তুলিয়া তুলিয়া তাহাকে দেখাইতেছে। কত রকমের কত অজস্র অলঙ্কার! তাহার কি চমৎকার কারুকার্য্য, কি অপূর্ব্ব শোভা! স্বর্ণ, চুণি, পান্না, ফিরোজ, মতি, হীরক প্রভৃতি মণিরত্নের একত্রীভূত জৌলস নয়ন যেন সহ্য করিতে পারে না! বিশেষতঃ হীরকালঙ্কারের কি মনোহর দীপ্তি! দাসী যখন শতনল হীরক হার, ও ছায়া-পথের ন্যায় ঘন-সংযুক্ত তারকাপ্রভ হীরক মুকুট তাহার সম্মুখে তুলিয়া ধরিল, শত শত সূর্য্যরশ্মি যেন তরঙ্গে তরঙ্গে তাহাতে খেলিয়া উঠিল, শক্তির নয়ন সে জ্যোতিতে ঝলসিয়া যাইতে লাগিল।

শক্তি দিনাজপুরের রাজবাটীতে রত্নালঙ্কার দেখিয়াছে বটে, কিন্তু এরূপ মণিরত্নের অনুপম কান্তি কখনও দেখে নাই।

বালিকা সেই অলঙ্কাররাশির মধ্য হইতে বিশুদ্ধ হীরকালঙ্কার কয়েকটি বাছিয়া লইল। সাজসজ্জা শেষ হইলে আবার সেই মুকুর গৃহে শক্তি আগমন করিল। নবাবসাহ তাহার সহিত দেখা করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়াছিলেন; এইখানে আসিয়া তাঁহাকে সংবাদ পাঠাইলেই তিনি আসিবেন। মুকুরে শক্তির সুসজ্জিত সালঙ্কৃত মূর্ত্তি প্রতিবিম্বিত হইল, শক্তি নিজেকে দেখিয়া নিজে বিস্মিত হইয়া গেল, আপনাকে আপনি যেন চিনিতে পারিল না; এ কি ভুবনমোহিনী রূপ! কিন্তু এ রূপ দেখিবে কে? কাহার জন্য এ সাজসজ্জা! ধীরে ধীরে শক্তির নয়নে অশ্রু সঞ্চিত হইয়া আসিল!

"হায়! সুখ কোথায়? গণেশদেব যখন তাহার হইলেন না তখন ধনে ঐশ্বর্য্যে ক্ষমতায় তাহার কোথায় সুখ! সুখ কিসে? সে কেবল ঐশ্বর্য্যের লোভে সুখের লোভে আত্ম বিক্রয় করিয়া দেহ বিক্রয় করিয়া আত্ম-সম্মান পর্য্যন্ত লোপ করিয়াছে। এই কি তাহার প্রতিশোধ! এ কাহার প্রতি প্রতিশোধ? অন্যকে হত্যা করিতে গিয়া সে আত্মহত্যা করিয়াছে! সে এখন পিশাচী প্রেত, তাহার প্রকৃত অস্তিত্ব পর্য্যন্ত এখন লোপ পাইয়াছে। এই বিরূপ বিকৃত অস্তিত্ব লইয়া তাহার আত্মীয় স্বজনের নিকটে যাইতেও আর সে সাহসী নহে। সে এখন মুসলমানের পত্নী! শক্তির স্মৃতিতে পর্য্যন্ত এখন তাঁহাদের ঘৃণার উদ্রেক করিবে। আর গণেশদেব,—তিনিই বা এখন কি ভাবিবেন? পূর্ব্বে সে তাঁহার ভালবাসার বস্তু না হউক সম্মানের বস্তুও ছিল! কিন্তু এখন?—হায় হায়! ইহা অপেক্ষা সে আজীবন সন্ন্যাসিনী রহিল না কেন!"

তাহার উগ্র কঠোর প্রকৃতি কোমল প্রেমোত্থিত অনুতাপে লীন হইয়া পড়িল। একজন দাসী বলিল, "নবাবসাহ আসিতে চাহেন—খবর দিব?" শক্তি বলিল, "আসিতে বল, আমি একটু পরে তাঁহার সহিত দেখা করিতে আসিতেছি।" এই বলিয়া শক্তি সেই ঘর হইতে চলিয়া গিয়া অন্য ঘরে আসিয়া একজন দাসীকে বলিল, "আমার পরিত্যক্ত কাপড় কোথায়? আন।" বলিতে বলিতে শক্তি নিজের সাজ-সজ্জা একে একে খুলিতে লাগিল। দাসী অবাক হইয়া বলিল, "বেগমসাহেব, নবাবসাহ বলিবেন কি?" শক্তি রুক্ষস্বরে বলিল, "সে ভাবনা তোমার নহে, তুমি শীঘ্র কাপড় লইয়া আইস"। দাসী নীরবে কাপড় আনিয়া দিল। শক্তি পূর্ব্ব বেশ পরিধান করিয়া মুকুর-গৃহে আসিয়া দেখিল, গায়সুদ্দিন তাহার জন্য অপেক্ষা করিতেছেন। শক্তির এই বেশ দেখিয়া তিনি আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন, "একি? এখনও সেই বেশ! বঙ্গেশ্বরীর উপযুক্ত বেশ ত ইহা নহে!"

শক্তি বলিল, "এখনও বঙ্গেশ্বরী হই নাই। যত দিন যুদ্ধ শেষ না হয় ততদিন আমার এইরূপ সাজই থাকিবে।"

গায়সুদ্দিন তাহার দৃঢ়স্বরে অসোয়াস্তি বোধ করিয়া বলিলেন, "প্রিয়তমে, তোমার জন্য ধন সম্পদ প্রাণ মন সমস্তই পণ করিয়াছি। তুমি প্রফুল্ল মুখে আমাকে এই বিপদে বল প্রদান করিবে; তাহা না হইয়া তোমার এ কি ভাব!" বলিতে বলিতে তাহার নিকট অগ্রসর হইতে লাগিলেন। শক্তি একটু সরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "জাঁহাপনা আমাকে স্পর্শ করিবেন না। আমি শপথ করিয়াছি যত দিন না যুদ্ধ শেষ হইবে তত দিন—"

গায়সুদ্দিন স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহার নয়নে ক্রোধাগ্নি

জলিয়া উঠিল। তাহাকে কথা শেষ করিতে না দিয়াই বলিয়া উঠিলেন, "তুমি আমার পত্নী—আমার সম্পত্তি, তোমার হুকুমে আমি কাজ করিব, না তুমি আমার আজ্ঞানুসারে চলিবে?" শক্তিরও নয়ন হইতে ক্রোধাগ্নি নির্গত হইল। সে দৃঢ়তাব্যঞ্জক স্বরে বলিল, "তবে আমি আপনার পত্নী নহি। আমাকে ছাড়িয়া দিতে আজ্ঞা হউক, আমি অন্যত্র যাই।"

এই সময় দাসী আসিয়া বলিল, "জাঁহাপনা, কুতব সাহেব শীঘ্র বাহিরে যাইতে বলিলেন; নহিলে, বিপদ সম্ভাবনা।"

দাসী চলিয়া গেল। গায়সুদ্দিন শক্তির অদম্য ইচ্ছায় নত হইয়া কাতর স্বরে বলিলেন, "প্রিয়তমে, ক্ষমা কর! আমিই তোমার আজ্ঞাবহ দাস। যুদ্ধে যাইতেছি বাঁচিয়া আসিব কি না জানি না, যাহার জন্য মরিতে চলিয়াছি একবার তাহার প্রেমালিঙ্গন পাইলে মরিতেও দুঃখ নাই।"

শক্তি কহিল, "জাঁহাপনা, আমার কথার অন্যথা নাই। যত দিন যুদ্ধ শেষ না হয় ততদিন আমাদের স্বামী স্ত্রী সম্বন্ধ নাই। যদি আমাদের উভয়ের অমঙ্গল না আনিতে চান তবে আমার কথা রক্ষা করিয়া চলুন। নহিলে, আপনার শত পাহারাও আমাকে আর আপনার অন্তঃপুরের মধ্যে আবদ্ধ রাখিতে পারিবে না ইহা নিশ্চয় জানিবেন।" বাহিরে চীৎকার ধ্বনি উঠিল। কুতব দ্রুতবেগে গৃহপ্রবেশ করিয়া বলিল, "আর এখানে নহে; বিলম্ব করিলে আমাদের সকলকেই বন্দী হইতে হইবে। দাসীগণ শিবিকায় উঠিয়াছে বেগমসাহেবকে শিবিকায় উঠাইয়া আমরা বনপথ দিয়া অগ্রসর হই।"

কোথায় সুখ! কোথায় সম্ভোগ! কোথায় আনন্দ। সর্ব্বস্ব-

পণের বিবাহের দিবসেই নিরানন্দ কলহ-স্মৃতি এবং আকুল আবেগপূর্ণ হৃদয় ভাব সঙ্গে লইয়া গায়েসউদ্দিনকে বিমর্ষ বিষণ্ণ-ভাবে বিপদ-সঙ্কুল পথে যাত্রা করিতে হইল!

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ।

বাদসাহের মরণ দুর্ব্বুদ্ধি ধরিয়াছে! একে ত তিনি ঘরে পরে শত্রু করিয়া বসিয়াছেন, তাহার উপর আবার না আছে তাঁহার একটা মতির স্থির, না আছে নীতির স্থির! নিত্য নিত্য পরস্পর বিরোধী হুকুমের জ্বালায় সৈন্যসভাসদদিগের প্রাণ ওষ্ঠাগত। কেবল তাহাই নহে, ইহার ফল মন্দ ঘটিলে দোষী অবশ্য যাহারা হুকুম পালন করে, কিন্তু ভাল হইলে যশের ভাগী তাহারা কেহই নহে। সভাসদদিগের মধ্যে একটা রুদ্ধ অসন্তুষ্টির প্রবাহ চলিয়াছে; সৈন্যগণও নিরুৎসাহ, ভগ্নচেতা। দেশে অন্নাভাব। যাহারা চাষ করিবে এক বৎসর কাল তাহারা অস্ত্র ধারণ করিয়াছে, স্ত্রীলোক এবং বালকের হস্তে কৃষিকার্য্যের ভার, দুর্ভিক্ষ পীড়িত দেশ সৈন্যদিগের রসদ যোগাইতে অসমর্থ। তাহাদের নিয়মিত দুই বেলা অন্ন জোটাও দায় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ইহার উপর ভাগ্যলক্ষ্মীও তাহাদের প্রতি অপ্রসন্ন, একবার যদি কোন রকমে তাহারা শত্রু-সৈন্য হটায় ত দুইবার নিজে হটে। এরূপে যুদ্ধ আর কতদিন চলে! সভাসদগণ পুনঃ পুনঃ বাদসাহকে

দিনাজপুরের রাজার সহিত সন্ধিস্থাপন করিয়া তৎসহায়ে গায়সুদ্দিনকে দমনের পরামর্শ দিতেছেন। বাদসাহ এতদিন সে কথায় কর্ণপাত করেন নাই, কিন্তু আর তাহা অগ্রাহ্য করিয়া চলিল না। গায়সুদ্দিন অত্যন্ত প্রবল হইয়া বহুল সৈন্যসহ রাজধানী অভিমুখে দ্রুতগতিতে অগ্রসর হইতেছেন। বাদসাহের সপুত্র তাঁহার গতিরোধে অসমর্থ হইয়া নূতন সৈন্য প্রার্থনা করিয়াছেন সভাসদ সকলে মিলিয়া একবাক্যে বাদসাহকে বলিতেছে গণেশদেবের সহিত সন্ধি স্থাপন করা হউক—তাহা হইলে তাঁহার এবং বাদসাহের একত্রিত সৈন্য সহাবলে গায়সুদ্দিনকে আক্রমণ করিতে পারিবে। নহিলে এ বিপদ হইতে সহজে উত্তীর্ণ হইবার আর উপায়ান্তর নাই। বাদসাহও এ কথা সত্য বলিয়া বুঝিলেন। অবস্থার কি অন্যায় অত্যাচার! প্রবলপ্রতাপ বাদসাহ তিনি—তাঁহার পদতলে ক্ষুদ্র দিনাজপুর কোথায় দলিত হইবে, না তিনিই তাহার নিকট আজ অনুগ্রহ ভিখারী! এই অত্যাচারী অবস্থাটাকে একবার হাতে পাইলে তাহার গলা টিপিয়া মারিলেও বাদসাহের ক্রোধ শান্তি হইত না, কিন্তু তাহা না পাওয়াতে তাঁহার রাগ উত্তরোত্তর আরও বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। তিনি ক্রুদ্ধস্বরে বলিলেন, "সামান্য দিনাজপুর এত দিনেও শাসিত হইল না! সেনাপতি, তুমি কোন কর্ম্মের নহ! আমার আজ্ঞা যে তুমি ভাল করিয়া পালন কর নাই ইহাই তাহার প্রমাণ। যে দিকে চাহিতেছি সেই দিকেই কেবল গাফেলি!"

সভাসদগণ সকলে নীরব হইয়া রহিল। সেনাপতি কহিল, "জাঁহাপনা, দিনাজপুরকে যখন আমরা ঘেরাও করি, তখন আর দুই দিন মাত্র টিকিয়া থাকিলেই সে আমাদের হস্তগত হইত।

কিন্তু আপনার আজ্ঞায় আমাকে সে আক্রমণ ত্যাগ করিয়া তৎক্ষণাৎ সসৈন্যে সুবর্ণগ্রামাভিমুখে যাইতে হইল।” আজিম খাঁর পিতা বৃদ্ধ মন্ত্রী কহিলেন, “যুবরাজ সেরিফুদ্দিন গায়সুদ্দিনকে বনগ্রামের পথে ঘেরাও করিয়া সেই সময় আরও সৈন্য চাহিয়া পাঠাইলেন কিন্তু—” বাদসাহ বলিলেন, “আমার বিশ্বাস মিথ্যা সংবাদে সেরিফুদ্দিনকে ভ্রান্ত করিয়াছিল।”

মন্ত্রী। মিথ্যা নহে প্রচুর সৈন্যাভাবে বনগ্রামের সমস্ত জলপথ স্থলপথ ভাল করিয়া ঘেরাও করা হয় নাই। একদিন পূর্ব্বে আজিম খাঁ সেখানে উপস্থিত হইতে পারিলে নিশ্চয়ই গায়সুদ্দিন গ্রেপ্তার হইতেন।

বাদ। আজিম খাঁ, সেত' তোমারই দোষ! এক দিন পূর্ব্বে আসিতে পারিলে যদি আমাদের জয় হইত, তবে তুমি আসিলে না কেন?

আজিম। জাঁহাপনা, বর্ষায় পূর্ণভাগা নদীর দুর্দ্দম্য স্রোতে উজান টানিয়া আসিতে একে বিলম্ব হইল, তাহার পর কর্দ্দমময় পথে শীঘ্র কুচ করিয়া চলা অসম্ভব, তাই যথা সময়ে পৌছিতে পারিলাম না!

বাদ। 'পারিলাম না'! ইতিপূর্ব্বে কখনও আমি এরূপ কথা কোন সেনাপতির মুখে শুনি নাই! তোমাকে সেনাপতির পদে নিযুক্ত করাই আমার অন্যায় হইয়াছে দেখিতেছি।”

সেনাপতি কোন উত্তর করিলেন না, নীরবে ক্রোধ দমন করিয়া বসিয়া রহিলেন। মন্ত্রী বলিলেন “যাহা হইয়া গিয়াছে তাহার জন্য শোচনা করায় এখন ত' আর কোন ফল নাই—বৃথা কাল ব্যয় হইতেছে মাত্র। প্রতি মুহূর্ত্তে গায়সুদ্দিন প্রবল হইয়া

উঠিতেছেন, অতি শীঘ্র তাঁহাকে দমন করিতে না পারিলে রাজ্য রক্ষা দুরূহ হইবে। দিনাজপুরের সহিত সন্ধিস্থাপিত হইবে কি না, এখনি তাহার মীমাংসা হওয়া আবশ্যক।”

আবশ্যকের উপর আর কথা নাই! বাদসাহ বলিলেন, “আচ্ছা, তবে সন্ধির প্রস্তাব কর, কিন্তু দেখিও আবার যেন অস্বীকারের অপমান সহ্য করিতে না হয়।”

আজিম খাঁ এ সম্বন্ধে দিনাজপুরের মত জানিয়াই এ প্রস্তাব করেন। সন্ন্যাসিনীকে লইয়াই তাহাদের বিবাদ। সন্ন্যাসিনীর মুক্তি এবং এই যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ-স্বরূপ দিনাজপুর নিষ্কর করিয়া দিলে গণেশদেব সন্ধিতে সম্মত ছিলেন। তাঁহার তরফ হইতে বাদসাহের নিকট এই প্রস্তাব উত্থাপিত হইলে বাদসাহও তাহাতে সম্মত হইলেন। তখন উভয় পক্ষ হইতে সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হইবার জন্য গণেশদেবকে রাজসভায় আহ্বান করা হইল। বাদসাহ যে তাঁহার কোন ক্ষতি করিবেন না, ইহার প্রমাণ-স্বরূপ বাদসাহের পৌত্র সাহেবুদ্দিন সপারিষদ গণেশদেবের শিবিরে জামিন হইয়া রহিলেন।

বিংশ পরিচ্ছেদ।

বাদসাহ শপথ ভঙ্গ করিলেন। গণেশদেবকে বন্ধুভাবে ডাকিয়া বন্ধুতার সমাদর প্রদান করিলেন না। রাজদরবারে তাঁহাকে বসিবার আসন পর্য্যন্ত প্রদত্ত হইল না।

আসল কথা, গণেশদেব সভায় আসিয়া সুলতানকে অভিবাদন পূর্ব্বক যখন উন্নত মস্তকে সোজা হইয়া দাঁড়াইলেন, তখন তাঁহার ভাব ভঙ্গিতে, সমগ্র মূর্ত্তিতে যে অক্ষুণ্ণ দর্প প্রকাশিত হইল বাদসাহের তাহা সহ্য হইল না। তিনি বাদসাহ হইয়া এই সামান্য যুবকের তেজ গর্ব্ব যে এতদিনে তিল পরিমাণেও খর্ব্ব করিতে সক্ষম হইলেন না, ইহাতে মর্ম্মে মর্ম্মে অপমান বেদনা অনুভব করিয়া এইরূপ অবজ্ঞায় তাহার প্রতিশোধ গ্রহণ করিলেন। বাদসাহের এই অযথা রূঢ় ব্যবহারে সভাসদ্‌গণ মনে মনে প্রমাদ গণিতে লাগিল, কাহারও মুখে বাক্য স্ফূর্ত্তি হইল না। ঝটিকার পূর্ব্বাহ্ণে যেন চারিদিক নিস্তব্ধভাব ধারণ করিল। বাদসাহ কিছু পরে ক্রোধরুদ্ধ গম্ভীর স্বরে বলিলেন, "গণেশদেব তুমি কি চাহ।"

গণেশদেব পূর্ব্ব হইতেই বুঝিয়াছিলেন লক্ষণ ভাল নহে; এ সমস্তই সন্ধিভঙ্গের সূচনা। তিনি বলিলেন, "আমি কি চাই, তাহা পূর্ব্বেই জানান হইয়াছে; আর আমার প্রস্তাবে জাঁহাপনা সম্মত হওয়াতেই সন্ধি স্বাক্ষরের জন্য এখানে আসিয়াছি। কিন্তু আবার যখন আপনি নূতন করিয়া এই প্রশ্ন উত্থাপন করিতেছেন,

তখন আপনার আজ্ঞায় জানাইতেছি যে, প্রথমতঃ আমি সন্ন্যাসিনীর মুক্তি চাই—দ্বিতীয়তঃ এই এক বৎসরের যুদ্ধে আমার যে ক্ষতি হইয়াছে, তাহার ক্ষতি পূরণ স্বরূপ দিনাজপুর নিষ্কর করিয়া দিতে হইবে।"

বাদসাহ ভ্রুকুটি কুটীল করিয়া বলিলেন, "কিন্তু তোমার বিদ্রোহিতায় আমার যে ক্ষতি হইয়াছে তাহার পূরণ হইবে কিরূপে ?"

গণেশ। যুবরাজের সহিত যুদ্ধে আমি আপনার সহায়তা করিব।

বাদসাহ। যে সামন্ত প্রজা—তাহার ইচ্ছা বা অনিচ্ছার উপর কি তাহা নির্ভর করে! সহায়তা না করিলে ত তুমি দণ্ডনীয়। এতদিন রাজবিদ্রোহী হইয়া যে অন্যায় করিয়াছ, তাহার কি শাস্তি ?

গণেশ। আপনার এক্তারের মধ্যে আনিবার পূর্ব্বে এ শাস্তির বন্দোবস্ত করিলে ঠিক হইত। বিশ্বাসস্থলে এখন শাস্তির কথা বিশ্বাসঘাতকতা মাত্র।

বাদসাহ। শঠের সহিত শঠতা বিশ্বাস ভঙ্গ নহে! এরূপ নহিলে শান্তিরক্ষার উপায় নাই। আজিম খাঁ, ইহাকে বন্দী কর।"

বাদসাহ যে এতদূর অপ্রকৃতিস্থ হইবেন, তাহা সভাসদেরা কেহ মনে করে নাই। তাহারা অবাক্ হইয়া রহিল। আজিম খাঁ রাজাজ্ঞা পালনে উদ্যত না হইয়া বদ্ধপদ বিস্মিতনেত্রে চাহিয়া রহিল। রাজার সহিত তাহারই কথাবার্ত্তা; আজিম খাঁর কথাতেই আশ্বস্ত হইয়া গণেশদেব এখানে আসিয়াছেন; সে অজ্ঞাত-ভাবে বিশ্বাসঘাতকতার কারণস্বরূপ হইয়াছে। তাহার সমস্ত সৎপ্রবৃত্তি ইহাতে আঘাত প্রাপ্ত হইয়া এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে

উত্তেজিত হইয়া উঠিতে চাহিল। সে আর নিস্তব্ধে থাকিতে না পারিয়া বলিল, "জাঁহাপনা, আপনার কথায় নির্ভয় দিয়া ইঁহাকে এখানে আনা হইয়াছে, এ বিশ্বাস ভঙ্গ করিলে আপনার সুনামে কলঙ্ক স্পর্শিবে, ভবিষ্যতে আর কেহ আপনার কথায় বিশ্বাস করিবে না।"

বাদসাহ বলিলেন, "চুপ বেয়াদব! করিমউদ্দীন, আজ হইতে তুমি সেনাপতি। বেআদব আজিম খাঁ এবং বিদ্রোহী গণেশকে বন্দী কর, বহুদিন পূর্ব্বেই উহাদের এই শাস্তি পাওয়া উচিত ছিল।"

করিম বলিল, "জাঁহাপনা, দ্বারদেশে বিদ্রোহীর সৈন্য সামন্ত রহিয়াছে, তাহাদের?"

"তাহাদিগকেও বন্দী কর"।

রাজাজ্ঞা প্রতিপালিত হইল। আজিম খাঁ ও গণেশদেবকে করিমউদ্দীন বন্দী করিয়া লইয়া গেল। মন্ত্রী মস্তকে করাঘাত করিয়া বলিলেন, "সুলতান, করিলেন কি? নবাবসাহকে দমন করিবার যে আর উপায় রাখিলেন না। আজিম খাঁকে বিনা দোষে বন্দী করিলেন! গণেশদেবকে"—

বাদসাহ তাঁহার কথা শেষ করিতে না দিয়া বলিলেন, "বিনাদোষে! তোমার পুত্র বলিয়া উহাকে এতদিন সেনাপতি রাখিয়াছিলাম; উহার জন্যই ত যত মন্দ ঘটিয়াছে!"

মন্ত্রী বলিলেন, "গণেশদেবকে বন্দী করিলেন—আবার দুই দিকে যুদ্ধ!"

বাদসাহ। তোমার বুদ্ধিশুদ্ধি লোপ পাইয়াছে,—গণেশদেব বন্দী হইল যুদ্ধ করিবে কে?

মন্ত্রী। তাহার সৈন্যেরা! রাজমাতাকে কম বলিয়া বিবেচনা

করিবেন না—যতক্ষণ একজনও সৈন্য অবশিষ্ট থাকিবে ততক্ষণ তাহারা রাজার বন্ধন মোচনের জন্য যুদ্ধ করিবে,—আর সাহেবুদ্দিন বন্দী আছেন; সে বিষয়ে কি ভাবিলেন? এ বার্ত্তা রাষ্ট্র হইবামাত্র যে তাহার প্রাণ যাইবে।"

বাদসাহ। গণেশদেবের যে সৈন্যেরা সঙ্গে আসিয়াছিল তাহারাও বন্দী; সহজে এ খবর তাহাদের শিবিরে পৌছিবে না, এই অবকাশে সাহেবুদ্দিনকে ছাড়াইয়া আন।

মন্ত্রী। জাঁহাপনা, আপনার হুকুম পালন করে কে? আমার কথা শুনুন, নিজের মঙ্গল দেখুন; আজিম খাঁকে ছাড়িয়া দিন; গণেশদেবকে বন্ধ করুন, নহিলে সর্ব্বনাশ হইবে। সয়তানে সয়তানে আপনাকে ধরিয়াছে!

বাদসাহ রাগিয়া বলিলেন, "তোমরাই আমার সয়তান! জান তোমার পুত্র কুতবই গায়সুদ্দিনের পরামর্শদাতা? তাহার জন্যই সমস্ত বিপদ।"

মন্ত্রী। সেজন্য আমি তাহাকে ত্যাজ্যপুত্র করিয়াছি।

বাদসাহ। কিন্তু তাহাতে আমার ক্ষতি কি কিছু কম হইয়াছে! আমার বেশ বিশ্বাস আজিম খাঁ তাহার সহিত মিলিয়া গুপ্তভাবে আমার সর্ব্বনাশ করিতেছে,—নহিলে এতদিনে শত্রু দমন হয় না, ইহাও কি কাজের কথা!

মন্ত্রী রাগ করিয়া বলিলেন, "তোবা তোবা! এ কি অবিশ্বাস! কোন্ দিন বলিবেন—আমিও গুপ্তভাবে গায়সুদ্দিনের পক্ষ হইয়াছি।"

বাদসাহ। আমার সন্দেহ হইতেছে! নহিলে তোমার নির্দ্দোষিতা দেখাইতে তুমি এত ব্যস্ত কেন!

দরবেশধর্ম্মী, সাধুনামা, পক্ককেশ, বৃদ্ধ মন্ত্রী রাজমুখে এই কথা শুনিয়া সক্রোধে বলিলেন, "সুলতান, আমি চলিলাম, ঈশ্বর আপনার বিপক্ষ, নহিলে এ দুর্ব্বুদ্ধি আপনার ধরিবে কেন! আমি আজ হইতে কর্ম্ম ত্যাগ করিলাম; কিন্তু এই শেষ কথা বলিয়া যাইতেছি আপনার এ যাত্রা আর উদ্ধার নাই।"

সভাসদগণ সকলে রাজ ব্যবহারে এতই ক্রুদ্ধ ব্যথিত হইয়াছিল যে মন্ত্রীর গমনে কেহই বাধা দিল না, হস্তের ইঙ্গিতে পর্য্যন্ত কেহ একবার তাঁহাকে থাকিতে অনুরোধ করিল না। মন্ত্রী চলিয়া গেলেন, একটা নীরব ক্রোধের তরঙ্গ মাত্র সভায় তরঙ্গিত হইতে লাগিল। বাদসাহ তাহার স্পর্শ অনুভব করিতে লাগিলেন।

তখন অপরাহ্ণকাল। সকাল হইতে আজ বৃষ্টি হইতেছে। মেঘাচ্ছন্ন দিনের ম্লানভাব সভাসদদিগের ম্লানভাবে মিলিত হইয়া সভা বিষাদাচ্ছন্ন করিয়া তুলিয়াছে। সেই স্তম্ভিত সভাগৃহ সহসা ঝটিকালোড়নে যেন তরঙ্গিত হইয়া উঠিল। দুইজন সৈনিক দ্রুতপদে গৃহ প্রবেশ করিয়া বলিল, "জাঁহাপনা, নবাবসাহ গায়সুদ্দিন আগত। নবাবসাহ জেলাসুদ্দিন তাঁহার গতিরোধে অপারক। সৈন্য লইয়া সেনাপতিকে এখনি অগ্রসর হইতে হুকুম হউক।"

বাদসাহের মুখ বিবর্ণ হইয়া পড়িল। তিনি উৎকণ্ঠিত হইয়া বলিলেন, "আজিম খাঁ! আজিম খাঁকে ডাক।"

করিমউদ্দীন উত্তর করিল, "আপনার আজ্ঞায় তিনি বন্দী।"

বাদসাহ চক্ষু লাল করিয়া বলিলেন, "যাও বন্ধন মোচন করিয়া এখানে লইয়া আইস।"

করিমউদ্দিন চলিয়া গেল। কিছু পরে ফিরিয়া আসিয়া

ম্লান বিমর্ষ মুখে বলিল, "আজিম খাঁ নাই, পলায়ন করিয়াছে।"

"পলায়ন করিয়াছে?"

"হাঁ।"

"কোথায়?"

"শুনিতেছি, নবাবসাহ গায়স্থদ্দিনের সহিত মিলিত হইবে।"

বাদসাহের চারিদিকে ঘর বাড়ী লোক জন সমস্তই যেন ঘুরিতে লাগিল। তিনি একটু স্তম্ভিত হইয়া বলিলেন,—"গণেশ দেবকে আন।"

উত্তর হইল, "তিনিও পলাতক!"

"তিনিও পলাতক! মন্ত্রি, মন্ত্রি, উপায় কি?

উত্তর হইল। "মন্ত্রী এখানে নাই—শুনা যাইতেছে তিনিও গায়স্থদ্দিনের সহিত মিলিত হইবেন।"

বাদসাহের শীতল শোণিত এই কথায় সহসা উষ্ণ হইয়া উঠিল। তিনি উত্তেজিত হইয়া বলিলেন, "কেহ নাই, সকলেই চলিয়া গিয়াছে! আচ্ছা চল; আমি যাইব। আমি তোমাদের সেনাপতি!"

বাদসাহের এই বিপন্ন অবস্থায় সভাসদগণ তাহাদের ক্রোধ ভুলিয়া গিয়াছিল—রাজার উত্তেজনাবাক্যে সকলেই উত্তেজিত হইয়া "সুলতানকি জয়" বলিয়া সোৎসাহে চীৎকার করিয়া দণ্ডায়মান হইয়া উঠিল। তখনি যুদ্ধসজ্জা আরম্ভ হইল; সন্ধ্যার পূর্ব্বে তাহারা কুচ করিয়া গায়স্থদ্দিনের গতিরোধে অগ্রসর হইল; পরদিন পিতা পুত্রে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে যুদ্ধ বাধিল। এ যুদ্ধের পরিণাম কাহারও অবিদিত নাই। ইতিহাস বহু দিন পূর্ব্ব হইতে তাহা ঘোষণা করিয়াছে—তৃতীয় দিনের যুদ্ধে দুর্ভাগ্য বাদসাহের

মৃত্যু হইল। তাঁহার শবরক্ষার অভিপ্রায়ে পূর্ব্ব হইতে নির্ম্মিত সুবৃহৎ আদিনা মসজিদের নিস্তব্ধ গুহায় তাঁহার আহত নির্জীব দেহ মৃত্তিকাসাৎ হইবার জন্য আশ্রয় লাভ করিল। পুত্র গায়সুদ্দিন তাঁহার সিংহাসন অধিকার করিলেন।

একবিংশ পরিচ্ছেদ।

বংশীহারীপুরের এক প্রান্তে বনস্থলীর উচ্চ মুক্তীকৃত প্রদেশে রাজা গণেশদেবের শিবির। শিবিরের নিম্নদিকে অদূরে এক নাতিবৃহৎ স্বচ্ছসলিলা পুষ্করিণী। জনপ্রবাদ, কোন অলৌকিক দৈববলে এই দীর্ঘিকার উৎপত্তি। বাদসাহের সহিত গণেশদেবের যুদ্ধ বাধিবার পূর্ব্বে নাকি উক্ত ভূখণ্ড শুষ্ক বন্য ভূমিতল মাত্র ছিল। গণেশদেব রাজবিদ্রোহী হইলে পর আজিম খাঁ কর্ত্তৃক তাড়িত অনুসরিত হইয়াও সৈন্যস্বল্পতা বশত যুদ্ধে প্রবৃত্ত না হইয়া যে সময় পলায়নপর হইয়াছিলেন, সেই সময় তাঁহার সৈন্য সামন্তগণ দুই দিন অনাহার অনিদ্রায় অবিশ্রান্ত চলিয়া অবশেষে এই বনপ্রদেশে আসিয়া উপস্থিত হয়। তখন গ্রীষ্মকাল। শ্রান্ত ক্লান্ত সৈন্যগণ ক্ষুধা তৃষ্ণায় অবসন্ন, এক অঞ্জলি করিয়া জলপান করিতে পারিলেও তখন তাহাদের প্রাণ রক্ষা হয়। কিন্তু বনের কোথাও জলাশয়ের চিহ্ন মাত্র নাই; সৈনিকেরা জলান্বেষণে ব্যর্থকাম হইয়া ফিরিতেছে; নিজে গণেশদেব অনেক খুঁজিয়া কোথাও জল পাইলেন না; এদিকে শত্রু আগতপ্রায়। এখান

হইতে চলিয়া যাইতে না পারিলে প্রাণ সংশয়, কিন্তু সৈন্যগণের একপদ অগ্রসর হইবারও আর সামর্থ্য নাই। গণেশদেব হতাশচিত্তে শত্রু-হস্তে আত্ম-সমর্পণ করিবার অপেক্ষা করিতেছেন; এমন সময় সন্ন্যাসিনী আহার্য্য দ্রব্য লইয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি গত কল্য সন্ধ্যাবেলা খাদ্য সংগ্রহ করিতে গিয়াছিলেন। এখানে আসিয়া জলাভাবে সৈন্যদিগের দুর্দ্দশা দেখিয়া কিয়দ্দূরে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলিলেন, "ঐ অশ্বত্থ বৃক্ষতলে দেখিয়াছ?" গণেশদেব বলিলেন, "কোথাও আর দেখিতে বাকি নাই।" সন্ন্যাসিনী বলিলেন, "তবুও আর একবার দেখা যাউক।" সন্ন্যাসিনীর অনুগামী হইয়া কিছুদূর না আসিতে আসিতে তাঁহাদের তৃষিত নেত্রের সম্মুখে বৃক্ষাবলীপ্রচ্ছন্ন তরলবারি টল টল করিয়া উঠিল। গণেশদেব অনুবর্ত্তী সৈন্যগণের সহিত আহ্লাদে আনন্দ ধ্বনি করিয়া কৃতজ্ঞতাপূর্ণ হৃদয়ে সন্ন্যাসিনীর চরণ ধূলি গ্রহণ করিলেন। সেই আনন্দ চীৎকার দূরের অবসন্ন শ্রান্ত সৈনিকদিগের কর্ণে পৌছিবামাত্র তাহারাও আশার বলে বলীয়ান হইয়া দলে দলে এই বাপী তটে আসিয়া সন্ন্যাসিনীকে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করতঃ প্রাণ ভরিয়া তৃষ্ণা নিবারণ করিতে লাগিল। ইহা দ্বারা আর এক অলৌকিক ঘটনা ঘটিল; সেই জলপানে তাহারা যেন অমৃত পানের বল লাভ করিয়া উঠিল। ইহার অল্পক্ষণ পরে শত্রুসৈন্য তাহাদের আক্রমণ করিলে তাহারা অল্প সংখ্যক হইয়াও অমিতবলে সেই প্রচুর বিপক্ষ সৈন্য ছিন্ন ভিন্ন মর্দ্দিত করিয়া তাহার মধ্য দিয়া চলিয়া গেল। সেই দিন হইতে এই দীর্ঘিকার নাম মিলনদীঘি; কেননা ইহারই প্রসাদে সসৈন্যে গণেশদেবের সে দিন জীবন লাভ হইয়াছিল।

এই পুষ্করিণীর শুভঙ্করী শক্তির প্রতি সেই দিন হইতে ইহাদের সকলেরি প্রগাঢ় বিশ্বাস, তাই আজ ইহার তীরবর্ত্তী বনপ্রদেশে রাজশিবির স্থাপিত। দ্বিপ্রহরের বৃষ্টি থামিয়া গিয়াছে; কিন্তু আকাশ এখনও মেঘাচ্ছন্ন। শরতের অপরাহ্ণ আজ অস্তমান সূর্য্যের কনক মাধুরীহারা। স্নিগ্ধ বৃক্ষ পত্র হইতে বিন্দু বিন্দু জল পড়িতেছে। চঞ্চল স্নিগ্ধ বায়ুসঞ্চালনে দীর্ঘিকাবক্ষ কণ্টকিত হইয়া উঠিয়াছে। ভেকেরা উচ্চস্বরে ডাকাইয়া আনন্দ রব করিতেছে; বনমধ্যে ঝিঁঝিঁর অবিশ্রান্ত সমতান উত্থিত হইয়া চারিদিকে প্রদোষ-গাম্ভীর্য্য ব্যাপ্ত করিয়াছে। সঙ্গীনধারী সশস্ত্র সবলকায় কোচ ও ভোজপুরী শিবিররক্ষক-প্রহরীগণের সমকাল বিক্ষিপ্ত পদশব্দ সেই গাম্ভীর্য্যের তাললয় রক্ষা করিতেছে।

দীর্ঘিকার প্রস্তর-বাঁধান উপকূলে তিন চারি জন রাজভৃত্য উপবিষ্ট। ইহারা সৈনিক নহে, কিন্তু ইহাদের বেশ ভূষা অনেকটা সিপাহীদিগেরই মত। এই যুদ্ধ বিদ্রোহের সময় শিবিরের বাহির হইতে হইলেই সকলকে সসজ্জ সশস্ত্র হইয়া নির্গত হইতে হয়। তবে সৈনিকদের ন্যায় নানারূপ অস্ত্র শস্ত্রে ইহারা সুসজ্জিত নহে। ইহাদের কটিবন্ধে একখানি করিয়া খড়্গ এবং হাতে, কাহারও বা হাতের কাছে একটা করিয়া শড়কি মাত্র। পাঠক মনে রাখিবেন,—তখনকার বাঙ্গালী এখনকার বাঙ্গালী নহে। যুদ্ধ ব্যাপারটা তখনকার বঙ্গবাসীদিগের পক্ষে কেবল পূর্ব্বজন্মের স্মৃতির মত ছিল না, তখন তাহাদিগকে সত্য সত্য যুদ্ধ করিতে হইত; সুতরাং পূর্ব্বোক্ত পরিচারকদিগের সিপাহী-সাজ অশোভন হয় নাই, কেবল একজনের অঙ্গে ছাড়া। ইনি আমাদিগের পরিচিতা রঙ্গিনী সুন্দরীর স্বামী, ওরফে নবীন

অধিকারী, যাত্রার দলের খ্যাতনামা একজন নেতা, রাজসভার একজন কবি, রাজা ইঁহার গানের বিশেষ পক্ষপাতী, সুতরাং নবীন অধিকারীর মানের সীমা নাই, তাঁহার মানভঞ্জনের পালা দিনাজপুরের আবালবৃদ্ধবনিতার ওষ্ঠাগ্রে। ইঁহার বয়স পঁয়তাল্লিশ; বিবাহ চারিটি। পিতামাতা তিন বিবাহ দিয়াছেন, আর মামাত ভাইয়ের সম্বন্ধ করিতে গিয়া নিজে সখ করিয়া এক বিবাহ করিয়াছেন। শেষের বধূটিই আমাদের রঙ্গিণী দেবী। এইরূপ অতিরিক্ত সৌভাগ্যবলে যাত্রা এবং সঙ্গে সঙ্গে চারি রত্নের অধিকারী হইয়া ব্রাহ্মণের জীবনটা সুখের মানভঞ্জনের পালাতেই কেবল কাটিতেছিল। ইতিমধ্যে হরিষে বিষাদ উপস্থিত! শান্তির রাজ্যে সহসা অশান্তি বিভ্রাট! নারীপুঞ্জ এবং প্রণয়কুঞ্জের স্থলে সহসা ধূম্রলোচনের আবির্ভাব! তাহা হইতে পলাইবারও যো নাই! রাণী রাজার সঙ্গ লইলেন, রঙ্গিণীসুন্দরীও রাণীকে ছাড়িয়া থাকিবেন না, এ অবস্থায় ব্রাহ্মণ করেন কি? অগত্যা তাঁহাকেও গানের ধুয়া ছাড়িয়া আগুনের ধূঁয়া সার করিতে হইয়াছে। এখানে রাজাকে গান শুনান তাঁহার কাজ নহে, রাজার সে অবসর নাই, এখন আবশ্যক হইলে সেনামহলে তিনি পাককার্য্যের সহায়তা করিয়া থাকেন। সসজ্জ হইবার ভয়ে ব্রাহ্মণ বড় একটা শিবিরের বাহির হন না। সাজ সজ্জায় ব্রাহ্মণ যে নিতান্তই অনভ্যস্ত, অপটু তাহা যদিও নহে, কিন্তু সে স্ত্রীলোকের সাজে। কৃষ্ণযাত্রায় স্বয়ং অধিকারী বৃন্দা দূতী। কিন্তু হায়! সে কি সাজ! আর এ কি সাজ! সাজ করিতে হইলে তাই ব্রাহ্মণের মন এখন আরও হুহু করিয়া উঠে! যাহা হউক আজ দিনটা মেঘলা, বিরহ-টপ্পাগুলি কণ্ঠাগত হইয়া বহির্নির্গত হইবার জন্য ছটফট

করিতেছে, কাজেই অগত্যা দূতীর বেশের পরিবর্ত্তে সৈনিকবেশ পরিয়াই তাঁহাকে সারঙ্গটা হাতে করিয়া পুকুরের ধারে আসিয়া বসিতে হইয়াছে। পাঠক বোধ হয় জানেন পর্ত্তুগিজরা এদেশে আসিবার আগে যাত্রায় বেহালার চলন ছিল না। এখানে আসিয়া মাথার বোঝাটা তিনি আগে ভাগে নীচে নামাইয়াছেন, পোষাকের উপর টিকিওয়ালা মুণ্ডিত মস্তকটি গানের তালে তালে নড়িয়া নড়িয়া উঠিতেছে, তিনি চক্ষু মুদ্রিত করিয়া সারঙ্গের সুরে সুরে গান ধরিয়াছেন—

সখি, নব শ্রাবণ মাস!
জলদ ঘনঘটা, দিবসে সাঁঝছটা;
ঝুপ ঝুপ ঝরিছে আকাশ!

কিন্তু আজ গান গাহিয়া তেমন সুখবোধ হইতেছে না। একে সমজদারের অভাব, তাহার উপর পাশের সঙ্গীগণ কাণের গোড়ায় অনবরত বিড় বিড় করিয়া কত কি বকিয়া রসভঙ্গ করিতেছে। কেবল তাহাতেই রক্ষা নাই, মাঝে হইতে একজন তাঁহার গা ঠেলিয়া প্রশ্ন করিয়া বলিল—"তুমি কি বল—ঠাকুর?"

ঠাকুর তখন অন্তরা একবার শেষ করিয়া আর একবার তাহাতে তান জমাইতেছেন—সহসা বাধাপ্রাপ্ত হইয়া বেজায় চটিয়া বলিলেন—"আমি আর বল্‌ব কি! সম্বৎসর যেন বর্ষাটা তোদের প্রবাসেই কাটে। এমন সব বদরসিকের পাল্লাতেও মানুষে পড়ে! আমাকে যদি আর বিরক্ত করবি ত আমি কিন্তু এখানে আর এক তিল থাক্‌বো না।"

শ্রীকান্ত পরামাণিক বলিল—"মুনসি মহাশয়, ঠাকুর কেমন গাচ্ছে শোন না, ওঁকে কেন বিরক্ত কর! গাও ঠাকুর! এতদিন

প্রবাসে পড়ে আছি, বিরহে হাড় জরে গেল। তুমি গাও ঠাকুর প্রাণটা তবু ঠাণ্ডা হোক”—

ঠাকুর আবার ধরিলেন—

ঝিমিকি ঝম ঝম নিনাদ মনোরম—
মুহুর্মুহু দামিনী বিকাশ—
আমার বঁধুয়া পরবাস—

পরামাণিক বলিল—“বাহবা ঠাকুর বাহবা, কি বল্‌বো পেলা কিছু হাতে নেই!”

ঠাকুর আনন্দে গাহিয়া চলিলেন—মুন্সি পরামাণিককে বলিল “তাপর তুই কি স্বপ্ন দেখেছিলি বল?”

পরামাণিক বলিল—“যেন আকাশের দক্ষিণদিক লালে লাল হয়ে গেছে!”

শ্যামসর্দ্দার। আর তার থেকে রক্ত উছলে মাটি ভেসে যাচ্ছে—কেমন?

পরামাণিক। সে কেমন রক্ত! রক্তে চারিদিকে সমুদ্র বইছে, তার মধ্যে তুফানের মত ঢেউ উঠছে, ঢেউগুলো সব যেন মানুষ, ওমা! হটাৎ দেখি, আমিও একটা ঢেউ! যেমনি দেখা অমনি অঝোর ঝরে কাঁদতে আরম্ভ করা! এমন সময়, সেই রক্তনদে কমলাসনা ভগবতী মূর্ত্তি আবির্ভাব হয়ে বল্লেন—“মাভৈঃ! মাভৈঃ! বেটা” অমনি স্বপ্ন ভেঙ্গে গেল।

সকলে। তাই ত বড় আশ্চর্য্য স্বপ্ন! মূর্ত্তি কার মতন মনে হোল?

পরা। যেন সন্ন্যাসিনীর মতন!

মুনসী। তাই হবে। তিনিই একবার আমাদের বাঁচিয়েছেন; আর তাঁর প্রসাদে এ যুদ্ধে আমরাই জয়ী হব। এ স্বপ্ন শুভ।

সর্দ্দার। তাই বল, মুসলমানের দর্পচূর্ণ হোক। কিন্তু বাদসার সঙ্গে ঝগড়া বড় সহজ কথা নয়!

পরা। কেন আমাদের রাজা বাদসার চেয়ে কম কিসে?

মুনসি। বিশেষ ভগবতী সন্ন্যাসিনী যখন আমাদের সহায়।

সর্দ্দার। তা সত্যি! তবে এতদিন হোল, ঘরসংসার সব ডুবলো, স্ত্রীপুত্রের যে কি দশা হয়েছে, কিছুই বলা যায় না, তাই প্রাণ আর বাঁধছে না। আচ্ছা ভাই মহারাণীর সন্ন্যাসিনীর উপর ভক্তি শ্রদ্ধা দেখিনে কেন? তিনি মায়ের নামে জ্বলে ওঠেন—বলেন, "ওই ত যুদ্ধ বাধালে,—ভণ্ডতপস্বিনী! রাজাকে ও না ছাড়লে রাজার মঙ্গল নেই!"

মুনসি। মহারাণীর বিশ্বাস বাদসার সঙ্গে ঝগড়া করলে একদিন রাজ্যনাশ প্রাণনাশ হবেই। যুদ্ধ ছেড়ে তিনি তাই মাপ চাইতে বলেন।

সর্দ্দার। কথাটা কিন্তু ঠিক বটে! এখন সন্ধিটা হয়ে গেলে হয়।

পরা। বোলো না! কথাটা ঠিক হোল? মহারাজ যদি একবার বাদসার কাছে নীচু হন, তাহলেই বাদসার লেজ ফুলে এমন কলাগাছ হবে, যে তখন হাজার তেল মল্লেও নিস্তার পাওয়া যাবে না! বাবা! দেশকে দেশ তখন কলমা পড়াবে তবে ছাড়বে। আর এই ধাক্কায় যদি আমাদের রাজা বাদসা হ'তে পারেন—তাহলে আবার রামরাজ্য,—দেশে কোন অত্যাচার থাকবে না; কি সুখের দিন হবে বল দেখি?

সর্দ্দার। তা বটে, তা ঠাকুরকে একবার জিজ্ঞাসা করা যাক, স্বপ্নটার অর্থ কি! ঠাকুর, ঠাকুর—বলি স্বপ্নটা ত শুনলে? বলদেখি আমাদের রাজা বাদসা হবেন কি না?

ঠাকুর তাহার ঠেলায় পড়িতে পড়িতে মাটীতে বাঁ হাতের ভর দিয়া বিস্ফারিত নেত্রে ক্রুদ্ধস্বরে বলিলেন, "আমি চল্লেম, আমার আর এখানে দেখছি পোষাল না!"

ঠাকুর সারঙ্গটা হাতে লইয়া উঠিয়া হন্ হন্ করিয়া চলিলেন। সর্দ্দার বলিল "ঠাকুর যেও না,—স্বপ্নের মানেটা বলে যাও।"

পরামাণিক ডাকিল—"সড়্‌কিগাছটা ফেলে গেলে, ঠাকুর! যাবে যাও ওটা নিয়ে যাও।"

মুনসি বলিল,—"ঠাকুর, পাগড়িটা পড়ে রইল যে। কেউ যদি মাথাটা লক্ষ্য করে ত আর আটকাতে পারবে না হে!"

ঠাকুর কাহারও কথা না শুনিয়া গোঁ হইয়া চলিয়া গেলেন। কিছু দূরে গিয়া ফিরিয়া চাহিলেন—দেখিলেন, তাহাদের আর দেখা যাইতেছে না, তিনি তখন একটা দ্বিস্কন্ধ বৃক্ষের দুই শাখার মধ্যে বসিয়া আপন মনে সারঙ্গ বাজাইয়া গাহিতে লাগিলেন,—

সখি নব শ্রাবণ মাস!
জলদ ঘনঘটা, দিবসে সাঁঝছটা,
ঝুপ ঝুপ ঝরিছে আকাশ!
ঝিমিকি ঝম ঝম, নিনাদ মনোরম,
মুহু মুঁহু দামিনী আভাষ!
পবন বহে মাতি, তুহিন কণাভাতি—
দিকে দিকে রজত উচ্ছ্বাস!
উছলে সরোবর, পত্র মরমর,
কম্পে থর থর পান্থ নিরাশ!
যুবতী যুবাজনা পরম প্রীতমনা,
দুঁহু দোঁহে বাঁধা ভুজপাশ!

বিরহে যাপি যামী ঘুমায়ে ছিনু আমি,
স্বপনেতে মিলন উল্লাস!
সহসা বজ্রপাত, কড়াক্কর নাদ,
কাঁপি উঠে হৃদয় তরাস!
নয়ন মেলি চাই, কোথাও কেহ নাই,
উথলিত আকুল নিশ্বাস!
আমার বঁধুয়া পরবাস!

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ।

গানটি শেষ হইলে সারঙ্গটা কোলে নামাইয়া আর একটি গান ধরিবার অভিপ্রায়ে ঠাকুর আবার গুণ গুণ আরম্ভ করিয়াছেন। সহসা নজরে পড়িল, তাঁহার ঠিক বামদিকে একটি সেফালি বৃক্ষের পাশ হইতে দুইটি উজ্জল আঁখিতারা তাঁহার দিকে দৃষ্টিপাত করিতেছে। ব্রাহ্মণ সেইদিকে চাহিতেই এক রমণীমূর্ত্তি নিকটে অগ্রসর হইয়া বলিল,—"ঠাকুর, প্রণাম হই, চমৎকার গান!

ঠাকুর স্তব্ধ হইয়া গেলেন, এ কোন বনদেবী আসিয়া তাঁহার কর্ণে প্রশংসাবাক্য ঢালিতেছেন! তাঁহাকে মৌন দেখিয়া রমণী বলিল,—"ঠাকুর, থামিলেন কেন? আর একটি গান করুন।" তিনি আনন্দাপ্লুত হইয়া আস্তে আস্তে দুই একবার গলা পরিষ্কার করিয়া বলিলেন, "গাহিতেছি—কিন্তু কি গাহিব?"

রমণী বলিল, "কি গাহিবেন? আর একটি বিরহ গান; নবীন অধিকারীর টপ্পা বড় ভালবাসি; আগে যেটি গাহিলেন, সেটি তাঁর না?"

ব্রাহ্মণের সঙ্গীতবিদ্যা সার্থক বলিয়া মনে হইল, জীবন ধন্য মনে হইল; তিনি আহ্লাদ গোপন করিতে না পারিয়া বলিলেন "আমিই নবীন অধিকারী।"

শক্তি পূর্ব্বেই তাহাকে চিনিয়াছিল। আট দশ বৎসরে ব্রাহ্মণ তাঁহার নিকট বিশেষ পরিবর্ত্তিত হন নাই, কিন্তু শক্তি সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত। শক্তি বলিল—"আপনি নবীন অধিকারী? আপনার গানের প্রশংসাই শুনিয়া আসিতেছি; আজ চক্ষু কর্ণের বিবাদ ভঞ্জন হইল; আমার মহা ভাগ্য! আর একটি গান শোনান।"

ব্রাহ্মণ গান ধরিলেন—

এমনি ক'রে—
তারো কি কাঁদে প্রাণ আমারো তরে?
সেথা—জোছনা রজনী, ম্লান কি, সজনি,
এমনি তাহারো নয়ন লোরে?
ঐ দুটি তারা, আপনাতে হারা,
শুনিছে তারো কি বিরহ গান?
মালাগাছি গলে তেমনি কি দোলে,
শুকান—তবু কি তেমনি মান?
বুকে ধরে চেপে উঠিছে কি কেঁপে,
শিহরে বা কভু অধরে রাখি?
স্মৃতির মিলনে, বিরহ বেদনে,
এমনি, স্বজনি, আকুল সেকি?

প্রাণ কেঁদে কয়, নয়, তাতো নয়,
সবি বিস্মরণ সে মায়াপুরে!
সেথা—পুরাতন বলে কিছু নাহি ছলে—
শুধু—বাজে বাঁশি নিতি নূতন সুরে।

ব্রাহ্মণ তান মান দিয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া এই গানটি গাহিতে লাগিলেন। শক্তি পার্শ্বে দাঁড়াইয়া স্তব্ধ অনিমেষনেত্রে তাহা শুনিতে লাগিল।

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়াছে; মেঘের আর চিহ্নমাত্র নাই; পরিষ্কার শুভ্র শারদগগণে চাঁদ উঠিয়াছে; বনতলে ছায়াসংযুক্ত জ্যোৎস্না ম্লানভাবে কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছে—আর সেই সুস্বর সঙ্গীত-লহরী কম্পমান জ্যোৎস্নালোক স্তম্ভিত করিয়া উর্দ্ধ হইতে উর্দ্ধে উঠিতেছে। হঠাৎ গান শেষ করিয়া ব্রাহ্মণ জিজ্ঞাসা করিলেন—"তুমি কে, দেবি?" এ কথা এতক্ষণ জিজ্ঞাসা করিতে ব্রাহ্মণ ভুলিয়া গিয়াছিলেন,—শক্তি একটু হাসিয়া বলিল, "বেশ দেখিয়া বুঝিতে পারিতেছেন না? আমি ভিখারিণী, ঠাকুর!"

ব্রাহ্মণ সারঙ্গটা ভূমে ফেলিয়া গলবস্ত্র হইয়া বলিলেন,—"আমাকে ছলনা করিতেছ! তুমি এই বনের অধিষ্ঠাত্রী দেবী"! ব্রাহ্মণ প্রণাম করিতে উদ্যত হইলে শক্তি ব্যাকুলতা দেখাইয়া তাঁহাকে নিরস্ত করিয়া কহিল,—"ঠাকুর, আমাকে পাপমগ্ন করিবেন না, আমি কায়স্থকন্যা, আমার কেহ নাই, আমি সত্যই ভিখারিণী।"

ব্রাহ্মণ বিস্ময়ে বলিলেন,—"ভিখারিণী! এমন ভিখারিণী ত কখনো দেখি নাই!"

শক্তি হঠাৎ বলিল,—"ঠাকুর, এ গানটিও কি আপনার?

'এমন যামিনী, মধুর চাঁদনী, সে যদি গো শুধু আসিত'? সেদিন একজন ভিখারীর মুখে শুনিতেছিলাম!"

ব্রাহ্মণ বলিলেন, "আমারি গান, মা, তুমি এত গান ভালবাস—নিজেও কি গাহিয়া থাক?"

শক্তি। হাঁ্যা, আমরা ভিক্ষা করিয়া খাই, একটু আধটু গান গাহিতে হয় বই কি।

ব্রাহ্মণ আগ্রহে কহিলেন,—"একটি কি শুনিতে পাই না? আমি মা তোমার পিতৃতুল্য, আমার কাছে গাহিতে ত লজ্জা নাই।"

শক্তি একটু হাসিয়া বলিল; "তা সত্য, কিন্তু আপনার মত গায়কের কাছে আমার গান গাওয়া ধৃষ্টতামাত্র, তবে আপনি বলিতেছেন—গাই।"—

শক্তি আস্তে আস্তে আরম্ভ করিয়া ক্রমে কণ্ঠ খুলিয়া গাহিল—

এমন যামিনী, মধুর চাঁদিনী,
সে শুধু গো যদি আসিত।
পরাণে এমন আকুল তিয়াসা,
যদি সে শুধু গো ভালবাসিত!
এ মধু বসন্ত, এত শোভা হাসি,
এ নব যৌবন, এত রূপরাশি,
সকলি উঠিত পুলকে বিকাশি,
সে শুধু গো যদি চাহিত।
মিথ্যা বিধি! তুমি, মিথ্যা তব সৃষ্টি,
কেন এ সৌন্দর্য্য নাহি যদি দৃষ্টি!
যদি হলাহলে ভরা প্রেমসুধা মিষ্টি,
কেন তবে প্রাণ তৃষিত!

নিজের গান অন্যের মুখে সুস্বরে সুলয়ে শুনিতে কিরূপ আনন্দ হয়, যিনি কবি তিনিই জানেন! শক্তির মুখে গান শুনিয়া ব্রাহ্মণের হৃদয় জ্যোৎস্নাপ্লাবিত সাগরের ন্যায় উথলিয়া উঠিল। ব্রাহ্মণ গদগদকণ্ঠে কহিলেন—"মা, আমি কি করিব?"

এই অস্পষ্ট ভাষার অর্থ শক্তি বুঝিয়া বলিল,"আমি ভিখারিণী, আমার জন্য আপনি কি করিবেন ঠাকুর? তবে একটি কাজ করিতে পারেন, আমি একবার রাজারাণীর সহিত দেখা করিতে চাই, এই যুদ্ধসংক্রান্ত কিছু গুপ্ত সংবাদ দিব।"

ব্রাহ্মণ একটু ভাবিয়া বলিল, "মহারাণীর আজ্ঞা আছে, যেন কোন সন্ন্যাসিনী ভিখারিণী রাজার কাছে যাইতে না পায়, তা আমাকে দিয়া কথাটা বলাইলে হয় না?"

শক্তি। না,—তাহা হইলে ত আগেই বলিতাম।

ব্রাহ্মণ। তা বেশ, কিছু ভাবনা নাই, আমার গৃহিণীকে বলিলেই সব ঠিক হইবে, তুমি আমার সঙ্গে এস।

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ

রাণীর সহিত দেখা করিবার জন্য শক্তি মোটেই ব্যস্ত ছিল না। কিন্তু মনে পাপ থাকিলেই বাহিরে যত সঙ্কোচ! কি জানি শুধু রাজার সহিত দেখা করিতে চাহিলে ব্রাহ্মণ যদি কোনরূপ সন্দেহ করিয়া বসে, তাই সে রাজার নাম করিতে গিয়া রাণীর পর্য্যন্ত নাম করিয়া বসিল।

আলোকিত শিবিরের প্রধান কক্ষে সামান্য খাটিয়ার উপর এক বৎসরের শিশু নিদ্রিত, গণেশদেব সেই শয্যায় এক উচ্চ বালিশের উপর পার্শ্ব ঠেসান দিয়া হাতে মাথা রাখিয়া শিশুর দিকে চাহিয়া আছেন। মাঝে মাঝে তাহার নিদ্রিত অধরে চুম্বন করিতেছেন। নিরূপমা নীচে পা রাখিয়া রাজার মাথার কাছে বসিয়া তাঁহার ঘন চুলের মধ্যে সরু সরু আঙ্গুলগুলি সস্নেহে সঞ্চালিত করিতে করিতে তাঁহাকে সৌৎসুক্যে নানারূপ সংবাদ জিজ্ঞাসা করিতেছে। রঙ্গিণী ভিখারিণীকে এই সময় কক্ষদ্বারে আনিয়া কহিল, "তুমি দাঁড়াও আমি খবর দিয়া আসি"। বলিয়া রঙ্গিণী ভিতরে প্রবেশ করিল। শক্তি দ্বারের কাছে আর একটু সরিয়া দাঁড়াইল। গণেশদেবকে এই প্রথম সে রাণীর সহিত একত্রে দেখিল, তাঁহার একটি সন্তান হইয়াছে এই সে প্রথম জানিল। নিরুপমা কি সুখশান্তির ক্রোড়ে অবস্থিত! তাহার কি সৌভাগ্য! স্বামীর সোহাগে, পুত্রের স্নেহে, সমাজের বিশুদ্ধ শ্রদ্ধার মধ্যে

তাহার জীবন আনন্দস্বপ্নের মধ্যে কাটিয়া যাইতেছে! শক্তির প্রেমহীন, সুখহীন, শান্তিহীন, দুঃস্বপ্নপূর্ণ ভীষণতরঙ্গ-নিপীড়িত, হতাশ জীবনের সহিত উহার কি প্রভেদ! ভগবান কি অপরাধে তাহার এরূপ বিষম দশা করিলেন? জলন্ত ঈর্ষায় শক্তির হৃদয়ে চিতাবহ্নি জ্বলিয়া উঠিল। রঙ্গিণী আসিয়া দেখিল শক্তি কক্ষদ্বার হইতে দূরে দাঁড়াইয়া। তাহাকে গৃহ প্রবেশ করিতে অনুরোধ করিলে সে বলিল, "রাজাকে এখানে ডাক, আমি অন্য কাহারো সাক্ষাতে সে কথা তাঁহাকে বলিব না"। রঙ্গিণী আবার গৃহপ্রবেশ করিল; কিছু পরে রাজা স্বয়ং তাহার নিকটে আসিয়া বলিলেন, "শুনিলাম কোন জরুরি গুপ্ত খবর দিতে আসিয়াছ। এখানে কেহ নাই, স্বচ্ছন্দে বলিতে পার"।

শক্তি স্বর ঈষৎ পরিবর্ত্তন করিয়া আস্তে আস্তে বলিল, "এখানে নয় পুষ্করিণী তীরে আসুন।" বলিয়াই রাজার অপেক্ষা না করিয়া সে অগ্রসর হইল, রাজাও নীরবে তাহার পার্শ্ববর্ত্তী হইয়া সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন। শক্তি পুষ্করিণীতীরে আসিয়া মস্তকাবরণ খুলিয়া চাঁদের দিকে মুখ ফিরাইয়া দাঁড়াইল। সহসা যদি চন্দ্রমা স্বর্গচ্যুত হইয়া তাঁহার সম্মুখে ভূমিতলে খণ্ড বিখণ্ড হইয়া পড়িত, তাহা হইলেও গণেশদেব বুঝি ততদূর বিস্মিত হইতেন না। তিনি মুগ্ধ চিত্রার্পিতের ন্যায় হইয়া পড়িলেন। কিছু পরে যেন সচেতন হইয়া সহসা একটু হঠিয়া দাঁড়াইয়া ঘৃণাসূচক গম্ভীর স্বরে বলিলেন,

"যবনি তুমি কেন?"

শক্তির মাথা ঘুরিতে লাগিল। সত্যই ত সে যবনী! কোন সাহসে তবে সে আবার গণেশদেবের নিকট আসিল? শক্তি

অনেক কষ্ট সহ্য করিয়াছে তাই সে এই অসহ্য ঘৃণা-নিষ্পেষিত হইয়াও সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "নামে মাত্র; আমি তাহার শয্যাভাগিনী নহি। আমার হৃদয় মন দেহ অকলঙ্কিত ভাবে এখনো তোমারি। তবে তুমি যদি আমাকে রক্ষা না কর, তাহা হইলে আমার এই বিশুদ্ধতা নষ্ট হইবে, তুমি উদ্ধার না করিলে আমার পাপানলে ঝাঁপ দেওয়া ছাড়া উপায়ান্তর নাই।"

সে দিন রাজা বালকের ন্যায় প্রেমিকের ন্যায় শক্তিকে দেখিয়া আত্মহারা, বিহ্বল হইয়াছিলেন। তাঁহার সেদিনকার কথা ন্যায়-ন্যায়বোধরহিত, মুগ্ধ, আত্মবিলুপ্ত, প্রেমময় হৃদয়ের কথা; কিন্তু আজ তিনি প্রশান্ত গম্ভীর অপক্ষপাতী কঠোর বিচারক হইয়া বলিলেন, "সেদিন আর নাই। তুমি যবন গৃহে বাস করিয়াছ, কিরূপে তুমি আমার পত্নী হইবে? ভবিতব্য উল্টান, কর্ম্ম খণ্ডিত করা আমার সাধ্যাতীত। সে দিন তোমাকে আমার করিতে পারিতাম; কিন্তু তখন তুমি চলিয়া গেলে, পরদিন তোমাকে সন্ধান করিতে গিয়া শুনিলাম, তুমি গায়সুদ্দিনের বেগম হইয়াছ।"

শক্তি বলিল, "সত্যই কি তোমার আমাকে বিবাহ করিবার ইচ্ছা ছিল! মহারাণীর অমত সত্বেও?"

রাজা বলিলেন—"হাঁ।"

শক্তি দেখিল, নিজের পায়ে সে নিজে কুঠার মারিয়াছে। প্রতিশোধপরবশ, ক্রোধপরবশ, জ্ঞানহারা, আত্মহারা হইয়া সুখের আশ্রয় ছাড়িয়া সে দুঃখের তরঙ্গে ঝাঁপ দিয়াছে। কে আর এখন তাহাকে উঠাইবে? রাজা যদি তাহাকে উঠাইতে যান ত নিজে শুদ্ধ অতলে ডুবিবেন! তাহাকে রক্ষা করা, তাহার কর্ম্মাভিশাপ খণ্ডন করা—এখন দেবতারো সাধ্য নহে। শক্তি আপনার দুরবস্থা

ভাল করিয়া বুঝিয়া যন্ত্রণা ব্যাকুল হইয়া কহিল, "তবে কি আমার কোনও উপায় নাই ?"

রাজা কহিলেন, "যে উপায় নিজে অবলম্বন করিয়াছ, তাহাই আছে। যাহাকে বিবাহ করিয়াছ, তাহার কাছে যাও, স্বামীই স্ত্রীলোকের একমাত্র অবলম্বন।"

রাজার মুখে—যাহার জন্য সে সুখ-শান্তি—এমন কি ধর্ম্মহীন—তাঁহার মুখে এই কঠোর নির্ম্মম উপদেশ বাক্য সাংঘাতিক হইতেও সাংঘাতিক! সেদিন যে গর্ব্বে সে রাজকুমারকে ত্যাগ করিয়াছিল আজিকার গভীর নৈরাশ্যময় দুঃখের কুল-কিনারা-হীন অবস্থায় সে গর্ব্বটুকু পর্য্যন্ত আর তাহার রহিল না! তাহার সব গিয়াছিল তবু আত্মগর্ব্ব, আত্ম গৌরবের জোরে সর্ব্বস্বান্ত হইয়াও সে নত হয় নাই। কিন্তু ঝটিকাচ্ছন্ন রাত্রে দিগভ্রান্ত নাবিকের যেন আজ সামান্য কম্পাসটি পর্য্যন্ত হারাইয়া গেল! সে হৃতগর্ব্ব, হৃতবল, রোরুদ্যমান হইয়া কহিল—"যাহাকে ভাল বাসি না, যাহাকে হৃদয় দিতে পারি না, কি করিয়া তাহার সহবাস করিব? রাজকুমার, আমাকে ততদূর হীন কর্ম্মে বাধ্য করিও না। আমাকে বিবাহ করিতে না পার আমাকে আশ্রয় প্রদান কর। যাহাকে ভালবাসি বরঞ্চ তাহার উপপত্নী হইতে পারি কিন্তু যাহাকে ভালবাসিনা কি করিয়া তাহার পত্নী হইব! রাজকুমার, সমাজ যাহাই বলুক, ভগবানের চক্ষে তুমি পতিত হইবে না, তুমি ধর্ম্মভ্রষ্ট হইবে না, আমাকে আশ্রয় প্রদান কর, আমাকে ত্যাগ করিও না।"

শক্তির সেই মর্ম্মোত্থিত কাতরবাক্যে গণেশদেব কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় নির্ব্বাক হইয়া পড়িলেন। ক্ষণকাল পরে সংযত হইয়া

তিনি বলিলেন, "শোন, শক্তি। রাজার ইচ্ছা করিলেও আমি আর তোমাকে আশ্রয় দিতে পারি না। প্রাণ বাহির করিলেও আমি আর তোমাকে আপনার করিতে পারি না, কেন না তাহা অকর্ত্তব্য, অন্যায়, পাপাচরণ। তুমি এখন অন্যের বিবাহিতা, অন্যের পত্নী। আমি যদি এখন তোমার স্বামী হইতে তোমাকে ছিন্ন করিয়া আশ্রয় প্রদান করি, তাহা হইলে তোমারও ধর্ম্ম নষ্ট হইবে, আমারও ধর্ম্ম নষ্ট হইবে। যে ভালবাসা ধর্ম্মের প্রতিকূল তাহা অবিশুদ্ধ তাহা পরিত্যজ্য;—তুমি ইচ্ছা করিয়া তাহাকে বিবাহ করিয়াছ,—তোমাকে সে বলপূর্ব্বক পাণিগ্রহণে বাধ্য করায় নাই; সুতরাং আমি কিরূপে বিবাহিত স্বামীর অধিকার হরণ করি! স্বামীই স্ত্রীলোকের গুরু, দেবতা, ধর্ম্ম। যাহাকে স্বামীরূপে বরণ করিয়াছ, অনন্যমনা হইয়া এখন তাঁহাকেই আত্মসমর্পণ কর; শুভ ইচ্ছায়, ধর্ম্মসংকল্পে ভগবান বল প্রদান করিবেন।"

শক্তির আর সহ্য হইল না! রাজার উপদেশ, তাঁহার মঙ্গল ভাব সে কিছুমাত্র উপলব্ধি করিল না। তাঁহার প্রত্যেক কথা, প্রেমহীন কঠোর বজ্রদণ্ডে তাহাকে আহত করিল মাত্র। ক্ষত বিক্ষত রক্তাক্তহৃদয়ে আবার তাহার অপমানব্যথা জাগিয়া উঠিল। রাজা যে তাহার প্রেমময় আত্মবিসর্জ্জনের মূল্য উপলব্ধি না করিয়া তাহা ঘৃণিত হেয় অসার দ্রব্যের মত অবহেলা করিলেন, ইহা তাহার মর্ম্মবিদ্ধ করিল। রমণীর সব সহে, কেবল ইহা সহে না। সে পূর্ব্বের গর্ব্ব সহসা ফিরিয়া পাইয়া অশ্রুহীন গম্ভীরভাবে বলিল,—"গণেশদেব, আমি কুলটা নহি। আত্মসম্মান, সতীত্ব রক্ষার জন্যই তোমার আশ্রয় চাহিতে আসিয়াছিলাম; তোমার

নিকট দেহ বিক্রয় করিবার অভিপ্রায় আমার ছিল না। কিন্তু সংসার যখন সে সম্মান রক্ষা করিতে চাহে না, সমাজ-সম্মানই যখন তোমাদের আদর্শ বস্তু, তখন তাহাই হউক; আমি হৃদয়ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া সমাজধর্ম্ম পালন করিয়াই চলিব! ইহাতে যদি পাপ হয়, সে পাপ আমার নহে; এ পাপে আমাকে যে বাধ্য করিয়াছে—এ পাপ তাহারই!"

এই কথা বলিয়া পূর্ব্বের সেই দিনকার মতই ঝড়ের বেগে শক্তি সেখান হইতে চলিয়া গেল। রাজা অনেকক্ষণ ধরিয়া একাকী সেই জ্যোৎস্নাদীপ্ত দীর্ঘিকাতীরে দাঁড়াইয়া রহিলেন।

* * * * *

গায়সুদ্দিন যুদ্ধজয়ী হইয়া শক্তির নিকট আসিয়া দেখিলেন, শক্তির আর সে সন্ন্যাসিনীর সাজ নাই, মণি মুক্তা আভরণে সজ্জাবতী হইয়া শক্তি বঙ্গেশ্বরীর রূপ ধারণ করিয়াছে। সুলতান নিকটে আসিয়া পদতলে মুকুট রাখিয়া বলিলেন, "প্রিয়তমে, বাঙ্গালার মুকুট এই তোমার পদতলে লুণ্ঠিত, এখন তোমার কথা রক্ষা কর"—

শক্তি তাঁহার আলিঙ্গনে আপনাকে ছাড়িয়া দিয়া দগ্ধহৃদয়ে কহিল—"আমি তোমারি হইলাম।"

চতুর্ব্বিংশ পরিচ্ছেদ।

দিনাজপুর এখন শান্তির রাজ্য। সুলতান সেকেন্দরসাহের জীবনের সঙ্গে সঙ্গে গণেশদেবের বিদ্রোহিতারও শেষ হইয়াছে; নূতন রাজার সহিত তাঁহার আর শত্রুতা নাই; পরস্পর তাঁহারা মিত্রতাসূত্রে আবদ্ধ। সুতরাং তিনি এখন নিশ্চিন্ত হইয়া রাজ্যের যথাবিধি মঙ্গলসাধনে তৎপর। যুদ্ধকালে যে সকল প্রাসাদাদি ভগ্ন হইয়াছিল, তাহা নূতনরূপে সংস্কৃত হইতেছে, রাজধানীর স্থানে স্থানে নূতন পথ, নূতন পরিখা, নূতন উদ্যানাদি নির্ম্মিত হইতেছে। প্রজাদের সুখ স্বচ্ছন্দের সীমা নাই, যুদ্ধে তাহারা যে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিল, রাজা তাহা যথাসাধ্য পূরণ করিতেছেন—কেবল মৃতদিগকে প্রাণ দিতে পারেন নাই মাত্র। এই সুখ শান্তির দিনে দুই বৎসর পূর্ব্বের দুঃখ কষ্ট তাহাদের নিকট এখন দুঃস্বপ্নের স্মৃতিমাত্র; বিপদের সে বিভীষিকা নাই, আছে কেবল সেই বিভীষিকাময় জীবনকাহিনীর আলোচনার সুখ;—সংসারে কাঁটাহীন সুখ যদি কিছু থাকে তবে ইহাই তাই।

রাজবাটীর কাছে নদীর ধারে নূতন বাগান হইয়াছে, তাহার পাশ দিয়া কয়েকজন নগরবাসী স্নানে গমন করিতেছিল। প্রাসাদের নহবতে ভৈরবী রাগিণী বাজিতেছিল, তাহার সঙ্গে গুণ গুণ করিতে করিতে মালীযুবা ফুলগাছের তলার মাটী নিড়াইতেছিল; আর রক্তবস্ত্রধারী এক বালক ফকীর নিকটের বৃক্ষ হইতে ফুল তুলিতে তুলিতে দূরোত্থিত ঢাকবাদ্যের মৃদু শব্দের প্রতি মনো-

নিবেশ করিতেছিলেন।—পথিক একজনের তাঁহার দিকে দৃষ্টি পড়িল,—সে বলিয়া উঠিল, —"দেখ—দেখ, ফকীর দেখ! যেন সাক্ষাৎ পীর! যাই একবার বাবার কাছে, ছেলেটা ত কিছুতেই সারছে না!"

দ্বিতীয় ব্যক্তি ফকীরের দিকে সৌৎসুক্যে দৃষ্টিপাত করিয়া অর্থপূর্ণভাবে মাথা নাড়িল।

প্রথম বলিল—"ফকীরজিকে তুই চিনিস? দোহাই তোর, আমাকে নিয়ে চ; পাঁচপীরের সিন্নি দিয়েছি, কালী মাকে পাঁঠা মেনেছি, কিছুতেই ছেলেটা"

তৃতীয় ব্যক্তি সহসা বলিয়া উঠিল, "ঢাকের বাদ্যি বাজে যে! আজ কি অমাবস্যা? কালীপূজো! ও বাদ্যি শুনলেই আমার বুক গুড় গুড় করতে থাকে! সে দিন সকালে কি সর্ব্বনেশে ঢাকই বেজে উঠেছিল!" তাহার দীর্ঘনিশ্বাস পড়িল।

চতুর্থ বলিল, "যাই বলিস, বাপু, সে এক জবর দিন গেছে! প্রাণগুলো সে দিনে খোলামকুচি মনে হোত! একটা শত্রুর গরদান নিতে পারলে এক প্রাণ একশবার দিয়েও দুঃখ ছিল না! বেটাদের কি চড়কি ঘোরানটাই ঘোরান গিয়েছিল!"

তৃ। তারা যদি আর দুদিন সবুর করতো, তাহলে কে কাকে চড়কা ঘোরাতো, দেখা যেতো। ভাগো ভাগো আপনারা পালাল! ভাঁড়ারে ত আর চাল ডাল এক মুটো ছিল না, কার জোরে বাবা আর লড়তে! ঢাক যে বড় জোরে জোরে বাজছে!

প্রথম ব্যক্তি ইতিমধ্যে দ্বিতীয়কে বলিল—"ঘাড় নাড়লি যে! মাথার দিব্যি কি জানিস বল!

প্র। বলবিনে ত কাউকে?

দ্বি। না।

প্র। তিন সত্যি?

দ্বি। তিন সত্যি।

প্রথম ব্যক্তি চুপে চুপে বলিল—"ও ফকীর নয় সাহেবুদ্দিন।"

দ্বিতীয় বিস্ময়ে চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল—"সাহেবুদ্দিন, নতুন বাদসার ভাইপো!"

অন্য সকলের কানে এ কথা পৌঁছিল। তৃতীয় বলিল, "তাকে না সুলতান মেরে ফেলেছে।"

প্র। না, সাত ভাইকে মেরেছে, আর এঁয়াকে মারবার জন্যে খুঁজে বেড়াচ্চে। ইনি আমাদের রাজার চরণে শরণ নিয়েছেন।

দ্বি। তুই কি করে জানলি?

প্র। কেন অধিকারীর স্ত্রীর কাছে আমাদের কাদি শুনে এসেছে,—এ কথা কি মিথ্যে হয়!

তৃ। তবেই হয়েছে! ও ঢাক আর কিছু নয়, আবার লড়াইয়ের গোল! কানাই সদ্দার, শুনেছিস! তোর মনের সাধ মিটলো, রক্তের নদী আবার বইলো!

দ্বি। কিন্তু আমরা আর লড়্‌তে পারবোনা! একটা ছেলে ত সিঙ্গে ফুকেছে, গিন্নি ত তার শোকে গেল, আর আধখানা ছেলে সেও যায় যায়—কে লড়্‌বে বলদেখি!

চতু। তোর ছেলের আর গিন্নির জোরেই কি না যুদ্ধ ফতে হোত! একবার কথা শোন—'কে লড়্‌বে'! রাজ্যে লক্ষি লোক থাক্‌তে 'কে লড়্‌বে'!

তৃ। তুই লড়িস্! আমরা সব রাজার কাছে গিয়া বল্‌বো—

এক জনের জন্যে আমরা লক্ষি জন প্রাণ দিতে পার্‌বো না। তার চেয়ে সাহেবুদ্দিনকে রাজ্য ফেরৎ দিন।

চতু। তোর পরামর্শ নিয়েই রাজা রাজ্য চালাবে কি না!

দ্বি। রাজা না শোনে রাণী-মাকে বল্‌বো। তিনি যখন নাইতে আস্‌বেন, আমরা তাঁর দু পা চেপে ধরে বল্‌বো, 'রক্ষা কর, মা জননি, নয় ত তোমার সন্তানদের বুকের উপর পা দিয়ে মাড়িয়ে চলে যাও।'

প্র। কিন্তু তাও বলি, খুড়ো বেটা একবার যদি ওকে হাতে পায় ত অমনি গলা টিপে মার্‌বে। ওদের ত দয়ামায়া নেই। আহা বালক, বাচ্ছা!

দ্বি। আমাদের রাজার কি দয়ার শরীর! যেন ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির!

এইরূপে গল্প করিতে করিতে তাহারা স্নানের ঘাটে আসিয়া পৌঁছিল।

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ।

প্রজারা যাহা অনুমান করিয়াছিল তাহাই ঠিক। সাহেবুদ্দিনকে গণেশদেব আশ্রয় দিয়াছেন এ কথা গোপনীয় হইলেও গায়সুদ্দিনের কর্ণে তাহা উঠিয়াছে। তাই তিনি কুতবকে তাহার সন্ধানে দিনাজপুর পাঠাইয়াছেন। গণেশদেবের মহাবিপদ, হয় শরণাগত বন্ধুকে মৃত্যুহস্তে সমর্পণ করিতে হয়—নয় আবার যুদ্ধ বাধে; রাজ্য ছারখারে যায়। সন্ন্যাসিনীর পরামর্শ—যুদ্ধ বাধে বাধুক, আশ্রিত রক্ষা, অন্যায় দমন, রাজ ধর্ম্ম। এ ধর্ম্ম রক্ষা করিতে গিয়া সর্ব্বস্বান্ত হইতে হয়, সেও ভাল।

গণেশদেবের মাতৃ-আজ্ঞা ইহার বিপরীত। তিনি বলিতেছেন,—সাহেবুদ্দিনকে আশ্রয় প্রদান করিলে ধর্ম্মরক্ষা হইবে না; ধর্ম্মহানি হইবে। এক জীবনের জন্য শত আশ্রিত প্রজার জীবননাশ রাজকর্ত্তব্য নহে, এই দণ্ডে সাহেবুদ্দিনকে কুতবের হস্তে সমর্পণ করিয়া দেশ রক্ষা করা হউক। গণেশদেবের কিন্তু এ কথা মনে লাগিতেছে না। তিনি ভাবিতেছেন, "আগে হইতে লাভ লোকসানের পরিমাণ নির্দ্ধারণ, ফলাফল গণনা করিয়া কর্ত্তব্য মীমাংসা করা কি ক্ষীণদৃষ্টি মানবের পক্ষে সম্ভবে? তাহা হইলে ন্যায়, মহত্ব, ধর্ম্মের প্রকৃতপক্ষে কোন কার্য্যকারী অস্তিত্বই থাকে না। তাহা হইলে যেখানে দশ জনে মিলিয়া এক জনের প্রতি অত্যাচার করিতেছে, সেখানে অন্য পাঁচ জন দর্শক নিশ্চিন্তভাবে দাঁড়াইয়া থাকুক, কেননা পাঁচ জন যদি দশ জনের সঙ্গে লড়িতে

যায় ত ক্ষতি তাহাদেরই নিশ্চয়। মনুষ্যত্ব, মহত্ত্বের লাভ অনেক সময় অনির্দ্দিষ্ট, অপ্রত্যক্ষ, তাহার জন্য আপাত প্রত্যক্ষ ক্ষতির বিরুদ্ধে দাঁড়ান তাহা হইলে অন্যায় কার্য্য হইয়া পড়ে। আর একদিক দিয়া দেখিলে, এইরূপ লাভ লোকসানের বিচার করিয়া কাজ করিতে হইলে বিচারকার্য্যও একেবারে অসম্ভব হইয়া পড়ে! কোন অপরাধেরই শাস্তি হয় না। কেমন করিয়া হইবে? একজন অপরাধীকে দণ্ড দিয়া সেই সঙ্গে কত নিরপরাধ ব্যক্তিকেও দণ্ডিত করিতে হইতেছে—কষ্ট দেওয়া হইতেছে, তাহার সংখ্যা নিরূপণ কে করে?

মানব সর্ব্বজ্ঞ নহে। মঙ্গল নিয়ম পালনে মঙ্গল হইবে, ইহা বিশ্বাস করিয়া মাত্র সে কাজ করিতে পারে। কিন্তু ফলতঃ সে নিয়ম পালনে মঙ্গল হইবে কি না—অদূরদর্শী মানবের পক্ষে তাহা স্থির সিদ্ধান্ত করিয়া কাজ করিতে হইলে কাজই করা হয় না। অনেক সময় বিচারে অবিচার ঘটে—মঙ্গল নিয়ম পালন করিতে গিয়া অমঙ্গল উৎপন্ন হয় সত্য, তথাপি মানবের কার্য্য করিবার পথ তাহাই। তাহাকে মূল ধরিয়া শাখায় উঠিতেই হইবে; অতীত দেখিয়া ভবিষ্যৎ বিবেচনা করিতেই হইবে; একটি কণ্টক বিদূরিত করিতে শত শাখার উচ্ছেদ করিতে হইবে, একটি ফল বাঁচাইতে শত পত্র নষ্ট করিতে হইবে; শত প্রাণের জলাঞ্জলিতে ন্যায় মহত্ত্ব রক্ষা করিতে হইবে—আত্ম পর, ক্ষুদ্র মহৎ নির্ব্বিভেদে ন্যায়-ধর্ম্ম, ঔদার্য্য, মহত্ত্বের সমাদর রক্ষা করিতে হইবে। অসম্পূর্ণদৃষ্টি মানবের কর্ত্তব্যমীমাংসার ইহাই একমাত্র উপায়।"

শক্তির অবস্থা গণেশদেবের হৃদয়ে কণ্টকের মত বিঁধিয়াছিল। যদিও তিনি তাহার জন্য সম্পূর্ণ দায়ী নহেন—তথাপি এই

ঘটনায় তিনি নিয়ত মনে মনে অপরাধীর আত্মগ্লানি অনুভব করেন। এখন তাঁহার মনে হইতে লাগিল "এই ত একজন ক্ষুদ্র রমণীর সুখশান্তি ধর্ম্মের উপর কুঠারাঘাত করিয়া, নিজের পৌরুষিক ধর্ম্ম জলাঞ্জলি দিয়া লৌকিক ধর্ম্ম রক্ষা করিলাম, সমাজবিপ্লব রহিত করিলাম, কিন্তু তাহার ফল কি অপর্য্যাপ্ত হিত! লোকে জানুক না জানুক আমি জানি, এই রাজ্যবিপ্লব সেই ক্ষুদ্র এক জনের প্রতি অন্যায়ের প্রতিফল! সমগ্র বঙ্গদেশ আপনার রক্তপাতেসেই সামান্য নারীর কষ্টের প্রায়শ্চিত্ত বহন করিতেছে। সে পাপের এখনও শেষ নাই তাই আবার নূতন অশান্তির সূচনা! নিরাশ্রয় সাহেবুদ্দিনকে মৃত্যুহস্তে সমর্পণ করিলে সে পাপের বৃদ্ধি ছাড়া লাঘব নাই। ভগবানের ইহা পরীক্ষা! তাহাই হউক, আমার বীর সন্তানগণের দেহোৎশিত প্রত্যেক রক্তবিন্দু আমার হৃদয়াশ্রুরূপে প্রবাহিত হইয়া আমার কার্য্যের প্রায়শ্চিত্ত সমাধা করুক! কিন্তু সেই নরক দৃশ্যের মধ্যেও কি আমার সান্ত্বনা নাই? আমি সেই বীর সন্তানগণের পিতা—যাহারা আমার জন্য, দেশের জন্য, অসহায়ের জন্য, ধর্ম্মযুদ্ধে প্রাণ সমর্পণ করিতেছে! যাহারা পুণ্যকীর্ত্তিতে অমরত্ব লাভ করিয়া—মহত্বের চিরদৃষ্টান্তস্বরূপ হইয়া স্বর্গের গৌরব রক্ষা করিবে! ভগবান তাহাই হউক!—বাহিরের বাধা বিঘ্ন যেন আর তোমার মঙ্গল ইচ্ছা পূর্ণ করিতে আমাকে হীনবল না করে।"

সভা বসিয়াছে। রাজধানীর মুখ্য প্রজামণ্ডলী সভাস্থলে সমবেত। সাহেবুদ্দিন সম্বন্ধে তাহাদিগের মতামত জানিতে রাজা তাহাদিগকে আহ্বান করিয়াছেন। সভা লোকপূর্ণ হইলে যথাসময়ে রাজা তাহাদিগকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,—"বৎসগণ,

এক বিপদ হইতে উত্তীর্ণ হইয়া আমরা আর এক বিপদের সম্মুখীন। গায়সুদ্দিন তাঁহার সপ্ত ভ্রাতার প্রাণবধ করিয়াও নিশ্চিন্ত হইতে পারেন নাই। অশ্রুবান বালক ভ্রাতুষ্পুত্রের রক্তপাতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন। এই বিপদকালে আমি যদি বিপন্ন বন্ধুকে পরিত্যাগ করি তাহা হইলে আমাদের আতিথ্যধর্ম্ম বন্ধুত্বধর্ম্ম লঙ্ঘন করা হয়, আর যদি তাহাকে আশ্রয় প্রদান করি তাহা হইলে গায়সুদ্দিনের সহিত যুদ্ধ বাধে। এই উভয় সঙ্কটস্থলে তোমরা কিরূপ পরামর্শ প্রদান কর ?”

চারিদিক হইতে একটা কোলাহলময় সমবাক্য উত্থিত হইল, “মহারাজের যাহা বিবেচনা তাহাই আমাদের শিরোধার্য্য। মহারাজ, আমাদের পিতামাতা প্রভু, আমরা আপনার সন্তান, দাস। আপনি যাহা আজ্ঞা করিবেন আমরা তাহা পালন করিয়া চলিব মাত্র।”

বহুকণ্ঠের এই বিপুল স্বর ক্রমে নিস্তব্ধতায় মিলাইয়া পড়িলে মুহূর্ত্ত পরে একজন ধীর সুস্পষ্ট ধ্বনিতে কহিল, “মহারাজ, আপনি যখন নির্ভয় প্রদান করিয়াছেন তখন এ সম্বন্ধে আমার যাহা বিবেচনা হইতেছে বলিব। সাহেবুদ্দিন বিপন্ন অসহায় আপনার শরণাগত হইয়াছেন, তাঁহাকে আপনার রক্ষা করা কর্ত্তব্য সত্য, কিন্তু আপনার সন্তানদিগের মঙ্গলের প্রতি দৃষ্টি রাখা আপনার তদপেক্ষা গুরুতর কর্ত্তব্য। এক্ষণে তাঁহাকে বাঁচাইতে গেলে আপনার সন্তানদিগকে মারিয়া তবে বাঁচাইতে হয়। বিগত যুদ্ধবিদ্রোহে আমাদের যে ক্ষতি হইয়াছে এখনও তাহার সম্যক পূরণ হয় নাই, সে শ্রান্তি এখনও একেবারে দূর হয় নাই, এই সময় আবার যুদ্ধ বাধিলে দেশের সমূহ অমঙ্গল। একজনের জন্য শত সহস্র সন্তানের

এই কষ্ট আনয়ন করা কি আপনি যুক্তি বা ন্যায়সঙ্গত বলিয়া বিবেচনা করেন ?”

প্রজাদিগের মনের গতি এই কথায় বিশেষ দিকে ফিরিল। তাহারা কেহ কহিল, “শুভ শুভ মহারাজ! আপনার জন্য আমরা শতবার প্রাণ দিব, কিন্তু একজন যবনের জন্য কেন আমরা প্রাণ হারাই !”

কেহ কহিল “মহারাজের জয় হউক! গত যুদ্ধে আমার চারিটি পুত্র মারা গিয়াছে! একটি পুত্র মাত্র এখন আমার অন্ধের যষ্টি। আপনার আজ্ঞা হইলে তাহাকেও যুদ্ধে পাঠাইয়া এই বৃদ্ধ বয়সে পুত্রহীন হইব --কিন্তু একজন পরের জন্য আপনি কি আপনার শত সহস্র সন্তানের এই অকাল মৃত্যু আনয়ন করিবেন ?”

বহু কণ্ঠ হইতে ইহার পর রব উঠিল, “জয় মহারাজার জয়! মহারাজ, আপনার সন্তানদিগকে আশ্রয় প্রদান করুন! একজন যবনের জন্য তাহাদিগকে হত্যা করিবেন না !”

তাহারা নিস্তব্ধ হইলে রাজা বলিলেন, “বৎসগণ, শোন। সন্তানের মঙ্গল পিতার সর্ব্বাগ্রে পালনীয়, ইহা সত্য। কিন্তু সন্তানের শরীর রক্ষা করিলেই তাহার প্রধান মঙ্গল সাধিত হয় না, তাহাকে ধর্ম্ম পালন করিতে শিক্ষা-প্রদান পিতা মাতার সর্ব্ব প্রধান কর্ত্তব্য, কেন না তাহাতেই তাহার প্রধান মঙ্গল। আমি যদি শরণাগত বন্ধুকে বিপদের ভয়ে পরিত্যাগ করি, তাহা হইলে তোমরা ধর্ম্মভ্রষ্ট হইবে। তাহাতে কেবল তোমাদিগের আতিথ্য ধর্ম্ম নষ্ট হইবে এমন নহে, তাহার পূর্ব্বকৃত সৎব্যবহারের বিনিময়ে কৃতঘ্নতাচরণ করা হইবে। তোমরা সকলেই বোধ হয় জান, সেকন্দর সাহ যখন আমার সহিত সন্ধি প্রার্থনা করিয়া আমাকে রাজসভায় ডাকিয়া

পাঠান,—আমার নিরাশঙ্কার নিদর্শনস্বরূপ সাহেবুদ্দিন তখন আমার শিবিরে জামিন স্বরূপে ছিলেন। অতঃপর সেকেন্দর সাহ তাঁহার শপথ ভঙ্গ করিয়া আমাকে এবং আজিম খাঁকে বন্দী করিলে আমার সৈনিক দুইজন কৌশলে পলায়ন পূর্ব্বক সেই সংবাদ শিবিরে আনয়ন করে। সাহেবুদ্দিন এই খবর শুনিয়া স্বেচ্ছায় আমার উদ্ধার প্রয়াসী হইয়া দ্রুত অশ্ব ধাবনে ৮ ঘণ্টার পথ ২ ঘণ্টায় অতিক্রম করিয়া অবিলম্বে প্রাসাদে গিয়া গোপনে আমাদিগকে মুক্তি প্রদান করেন। তাঁহার বিপদকালে যদি আমরা সেই সদ্ব্যবহার ভুলিয়া তাঁহাকে শত্রুহস্তে সমর্পণ করি—তাহা হইলে কি আমাদের উপযুক্ত কাজ করা হয়?—বৎসগণ, তাহা হইলে তোমরা কৃতঘ্নতা পাপে লিপ্ত হইবে। পিতা সন্তানদিগকে অক্ষত রাখিতে নিজের শোণিত বিসর্জ্জন করিতে কুণ্ঠিত হন না। একা আমার রক্তপাতে যদি তোমাদের সুখ শান্তি ধর্ম্ম রক্ষা হইত, আমি অকাতরে সুখে তাহা সমর্পণ করিতাম। কিন্তু এস্থলে তাহা হইবার নহে। এই ধর্ম্মযুদ্ধ করিতে হইলে তোমাদেরও রক্তপাত করিতে হয়; ইহাতে আমার হৃদয় যন্ত্রণা-পীড়িত। কিন্তু এই দারুণ যন্ত্রণাসত্ত্বেও আমার সন্তানদিগকে আমি ধর্ম্মের জন্য প্রাণ সমর্পণ করিতে উপদেশ দিতে বিরত হইতে পারিলাম না। ইহা একজন ক্ষুদ্র যবনের জন্য প্রাণ সমর্পণ নহে; অসহায়ের জন্য, দুর্ব্বলের জন্য, পূর্ব্বকৃত উপকারের জন্য, ন্যায়ের জন্য, বন্ধুত্বের জন্য ইহা ধর্ম্মযুদ্ধ। এ যুদ্ধে মৃত্যুতে ইহলোকে কীর্ত্তি, পরলোকে স্বর্গলাভ! যদি একদিন মরিতেই হইবে তবে এই পুণ্য সংগ্রামে কিসের ভয়?”

“আমাদের মহারাজ ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির!” “আমরা যুদ্ধে

যাইব”—“ধর্ম্মযুদ্ধে প্রাণ দিব”—“জয় জয় মহারাজের জয়”—এই-রূপ বাক্যে সভাস্থল আলোড়িত, তরঙ্গিত হইয়া উঠিতে লাগিল।

রাজা বলিলেন, “শোন, বৎসগণ, মিথ্যা অকারণে আমার প্রজাদিগের, আমার সন্তানদিগের একটি চুলও আমি নষ্ট হইতে দিব না। প্রথমে আমি গায়সুদ্দিনের নিকট সাহেবুদ্দিনের মুক্তি প্রার্থনা করিব। সাহেবুদ্দিন যে গায়সুদ্দিনের ক্ষতি করিবেন না; সেজন্য আমি স্বয়ং জামিন হইতে চাহিব, এবং তাহার বদলে সাহেবুদ্দিনকে কোন দূরদেশে উচ্চপদাভিষিক্ত করিয়া পাঠান হউক—এইরূপ প্রস্তাব করিব। যদি এ প্রস্তাবে সুলতান সম্মত না হন, তাহা হইলেই আমাদের যুদ্ধ করিতে হইবে, নচেৎ নহে।”

প্রশ্ন হইল “কিন্তু সাহেবুদ্দিন যদি তাঁহার শপথ ভঙ্গ করেন? মুক্তি পাইলে যদি রাজবিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হন? তাহা হইলে?”

রাজা বলিলেন, “সাহেবুদ্দিন অত্যন্ত সংস্বভাব, ধর্ম্মভীরু! আমার এই ব্যবহারের পরিবর্ত্তে তিনি কখনই তাঁহার শপথ ভঙ্গ করিয়া আমাকে অপমানিত করিবেন না। অন্ততঃ গায়সুদ্দিনের মৃত্যু পর্য্যন্ত তিনি বিদ্রোহী হইবেন না। তাহার পর তিনি রাজত্ব চাহেন—আমি পর্য্যন্ত তাহার জন্য যুদ্ধ করিব।”

প্রজারা ইহাতে সন্তুষ্ট হইয়া রাজার অভিমতে তাহাদের সম্মতি জ্ঞাপন করিল। রাজা সেই দিনই অপরাহ্নে কুতবকে তাঁহার মনোভাব স্পষ্ট করিয়া বলিলেন। কুতব তাঁহার সাহসে, স্পর্দ্ধায় বিষম ক্রুদ্ধ হইয়া প্রত্যুত্তরে তাঁহার মুণ্ডপাত সঙ্কল্প জানাইয়া দিল। রাজা বলিলেন, “তবে তাহাই হউক, আমার মুণ্ডপাত করিয়া সাহেবুদ্দিনকে লইতে পারেন লউন, নহিলে তাহাকে পাইবেন না।”

ষড়্বিংশ পরিচ্ছেদ।

গণেশদেবের স্থির বিশ্বাস সাহেবুদ্দিনকে আশ্রয় দান করিয়া তিনি ন্যায়কার্য্য করিয়াছেন। সুতরাং এজন্য যুদ্ধ করিতে তাঁহার দুঃখ নাই, অনুতাপ নাই। কিরূপে এই ন্যায়যুদ্ধে তিনি জয়লাভ করিবেন, এই অশান্তিময় অত্যাচার দমন করিয়া আবার শান্তি, ন্যায় ফিরাইয়া আনিবেন, ইহাই কেবল তাঁহার চিন্তার একমাত্র বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

সমস্ত দিনের সভাকার্য্য, বাদানুবাদ, অবশেষে অনিবার্য্য যুদ্ধ সঙ্কল্পের পর তিনি যখন রাত্রিকালে অন্তঃপুরে আগমন করিলেন, তখনও তাঁহার এইরূপ চিন্তাবেগে মস্তক আলোড়িত হইতেছিল।

রাজাকে দেখিয়া নিরুপমা বলিল,—"মা বড় রেগেছেন, সাহেবুদ্দিনকে তুমি আশ্রয় দাও তাঁর এরূপ ইচ্ছা নয়।"

রাজা বলিলেন,—"তোমার কি মনে হয়—তাকে আশ্রয় দিয়ে আমি কি অন্যায় করেছি?"

নিরুপমা বলিল,—"অন্যায় করেছ! তোমাদের মত লোকেও যদি অসহায়ের সহায়তা না করে, নিরাশ্রয়কে আশ্রয় না দেয়, তাহলে সংসারে দুর্ব্বল আতুরের দশা কি হবে? তুমি তোমার উপযুক্ত কাজই করেছ।"

রাজা স্বহস্তস্থিত রাণীর হস্ত অধরে স্পর্শ করিয়া বলিলেন,—"ইহাই স্ত্রীলোকের কথা।" নিরুপমার এই অনুমোদন বাক্যে রাজাকে আহ্লাদিত হইতে দেখিয়া সে আনন্দপূর্ণ হইয়া উঠিল,

এবং সেই আনন্দ গোপন করিতে গিয়া সহসা বলিল—"একটা নতুন খবর শুনেছ? শক্তিকে অবশ্য মনে আছে? সে গায়-সুদ্দিনের বেগম হয়েছে।"

রাজা বলিলেন,—"সত্যি?"

রাণী। তুমি জান না? কুতুবের শিবির থেকে এ কথা রাষ্ট্র হয়েছে,—তা ত মিথ্যা হতে পারে না। ছি! ধনের লোভে যবনী হল! মাগো!

শক্তির প্রতি এই ঘৃণাসূচিত বাক্যে রাজার হৃদয় ব্যথিত হইল। ইহা বৃথা অপবাদ—শক্তি যথার্থপক্ষে হীন রমণী নহে; তাহার এ দুর্দ্দশা কেবল তাঁহাকে ভালবাসিয়া; তিনিই তাহার এই হেয় জীবন গ্রহণের কারণ। রাজা বলিলেন, "কিসের জন্যে সে যবনী হয়েছে তুমি কি করে জানলে? আর মুসলমান হলেই কি মানুষ হেয় হয়! হিন্দু মুসলমান সকলেই ত এক বিধাতৃপুরুষের সন্তান,—তুমি কেন মনে করছ তুমি শ্রেষ্ঠ—আর তারা নিকৃষ্ট?"

রাণী। কে জানে! আমার মুসলমানকে বড় ঘৃণা করে। স্বর্গ আমার হাতে দিলেও আমি মুসলমান ধর্ম্ম নিইনে।

রাজা। অন্যায় ঘৃণা! তাহলে যবনেরা হিন্দুদের ঘৃণা করলে কেন তোমরা তাদের দোষ দাও? হিন্দুজাতির যথার্থ গৌরব তাদের উদারতায়, যদি হিন্দু বলে গর্ব্ব থাকে ত অন্য কাকেও ঘৃণা করো না।—সকলকেই আত্মবৎ মান্য ক'রো।

রাজার কথা সত্য বুঝিয়া নিরুপমা লজ্জিত হইল, অপ্রতিভ হইয়া বলিল, "তা যাই হ'ক শক্তি যদি আসে আমি কিন্তু তার সঙ্গে সমানভাবে মিশতে পারব না।"

রাজা বলিলেন, "সে হল বঙ্গেশ্বরী, আর তুমি হলে সামান্য

দিনাজপুরের রাণী – তার অধীন সামন্তপত্নী, সে যদি তোমার সঙ্গে সমানভাবে মেশে তবে সেতো তোমারি গৌরবের কথা!"

নিরুপমার বড় দুঃখ হইল, শক্তির প্রতি রাজার সেই সম্মান ভাবে সে আপনাতে আপনি নিতান্ত ক্ষুদ্র হইয়া পড়িল। তাহার সেই পুরাতন কথা আবার মনে পড়িল। সত্যই ত! নিরুপমা কি শক্তির সমযোগ্য! রাজা শক্তির গলায় ফুলের মালা পরাইয়াছিলেন, তাহাকে ত পরান নাই!" হৃদয়ে আঘাত অনুভব করিয়া নিরুপমা অভিমানভরে মুখে কেবলমাত্র বলিল "তাই ত!"

এমন সময় দ্বারে সহসা করাঘাত পড়িল। রাজা চমকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "কেও?"

রঙ্গিণী উত্তর করিল, "ভগবতী সন্ন্যাসিনী সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছেন।"

রাজা সচকিতে উঠিয়া দ্বার খুলিয়া দিলেন। সন্ন্যাসিনী বলিলেন, "তোমার মাতা কুতবকে সাহেবুদ্দিনের গৃহের সন্ধান দিয়াছেন, সাহেবুদ্দিন বোধ হয় এতক্ষণে বন্দী হইলেন – এখনি যদি কোন উপায় করিতে পার ত দেখ।"

রাজা ব্যগ্রভাবে বলিলেন, "আপনি সহরকোতোয়ালকে বলুন-- সৈন্য লইয়া শীঘ্র আমার সাহায্যে আসে, আমি ততক্ষণ প্রাসাদের প্রহরীসৈনিক যাহাদের পাই লইয়া অগ্রসর হইতেছি।"

রাজা দ্রুতপদে চলিলেন। দ্বারদেশে যে সকল প্রহরীদিগকে দেখিতে পাইলেন তাহাদিগকেই সঙ্গে লইয়া চলিলেন। তাঁহারা কুতব-সেনার গতিরোধ করিয়া দাঁড়াইতে পারিলে তখন অন্য সৈনিকেরা আসিয়া যোগ দিতে পারিবে। ক্রোধোত্তেজিত, প্রাণ ভয়শূন্য রাজা অসম সাহসে ভর করিয়া কতিপয় মাত্র সৈন্য সঙ্গে

লইয়া বহুসংখ্যক সৈন্যমণ্ডলীর মধ্যে আসিয়া পড়িলেন। কিন্তু ইহাতে সাহেববুদ্দিন উদ্ধার পাইলেন না; কেবল সেই অন্ধকার রজনীতে কুতবের সৈন্যব্যূহের মধ্যে অভিমন্যুর ন্যায় গণেশদেবকে তৎক্ষণাৎ বন্দী হইতে হইল।

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ।

পাণ্ডুয়ার রাজপ্রাসাদ শক্তিময়ীর আবাস নহে। তিনি নদীতীরস্থ এক উদ্যান ভবনে স্বতন্ত্র থাকেন। অন্য বেগমদিগের সহিত তাঁহার কোন সম্পর্ক নাই। উদ্যানে ফোয়ারা ছুটিয়াছে, ফুলের তারকা ফুটিয়াছে, পদ্মপত্র-শোভিত সুদীর্ঘ ঝিল কানন বিসর্পিত করিয়া চলিয়াছে। কেবল তাহাই নহে, মুসলমান রাজার এই প্রমোদ নিকেতনে যথেষ্ট হিন্দুরুচি হিন্দুভাবও বিদ্যমান। উদ্যানের স্থানে স্থানে অধিকাংশ হিন্দু দেবদেবীর প্রস্তর মূর্ত্তি বিরাজমান। কোথায় সুসজ্জিতা রাধিকা, কোথায় মুরলীধারী কৃষ্ণ, কোথাও বীণাপাণি সরস্বতী, কোথাও পদ্মাসনা লক্ষ্মী, কোথাও বল্কলপরিধানা মৃগসান্নিধ্যা মৃৎপাত্রহস্তা শকুন্তলা, কোথাও বা রত্নাবলী উদয়ণ রাজাকে দেখিয়া লজ্জাবনতমুখে দাঁড়াইয়া আছে।

রজত সন্ধ্যা। উদ্যান প্রান্তে পূর্ণভাগা জ্যোৎস্নাপ্লাবিত হইয়া আনন্দসঙ্গীত গাহিতে গাহিতে চলিয়াছে। ফোয়ারার ঝর ঝর তান এবং বায়ুহিল্লোলিত বৃক্ষাবলীর মৃদুরব নদীর সেই মৃদুমধু

কল্লোলে মিশিয়া সন্ধ্যা-কানন সুমধুর সঙ্গীতময় করিয়া তুলিয়াছিল। কাননের সেই মধুর গীতোচ্ছ্বাস সহসা যেন স্তব্ধ করিয়া শক্তি উগ্র কঠোর স্বরে কহিলেন,

"এ কি শুনিতেছি! বালক সাহেবুদ্দিনকে ফাঁসি দিবার জন্য নাকি তাহাকে ধরিতে লোক গিয়াছে? ছি ছি—এমন নিষ্ঠুরকে আমি বিবাহ করিয়াছিলাম!"

গায়সুদ্দিন এই কাননে আসিয়া কদাচ তৎক্ষণাৎ শক্তির দেখা পান। কোনদিন বা বার বার ডাকিতে ডাকিতে শক্তি এ উদ্যানে আগমন করেন—কোনদিন বা তাহাতেও তাঁহার অবসর হয় না—তিনি কন্যাকে লইয়া এমনি ব্যস্ত থাকেন। আজ সুলতান তাঁহাকে এখানে দেখিয়া আশ্চর্য্য হইলেন! কিন্তু তাঁহার কথা শুনিয়াই বুঝিলেন, মহিষী প্রেমালাপের উদ্দেশ্যে তাঁহার অপেক্ষা করিতেছেন না।

তিনি শক্তির নিকট মর্ম্মরাসনে বসিয়া তাঁহার কথার উত্তরে কহিলেন, "তোমা হইতেও নিষ্ঠুর! প্রিয়ে, হৃদয় মন প্রাণ যথাসর্ব্বস্ব তোমার চরণে উৎসর্গ করিয়াও তোমার মন পাইলাম না। আমি আমার শত্রুর প্রাণসংহার করিয়াছি বলিয়া নিষ্ঠুর বলিতেছ—কিন্তু"—

গায়সুদ্দিনের নিকট হইতে অত্যাচার শক্তিময়ী সহিতে পারেন, কিন্তু তাঁহার প্রেমালাপ তাঁহার পক্ষে অসহ! শক্তি স্বামীর প্রেমসম্ভাষণ কঠোর ভর্ৎসনায় নীরব করিতে প্রয়াস পাইয়া বলিলেন, "ইহা নিষ্ঠুরতা নহে! হইতে পারে তোমাদের যবন ভাষায় ইহাই বীরত্ব। সাত ভাইকে মারিয়া আশ মিটিল না; আবার বালকের রক্তপাত! সব সহে—পুরুষের কাপুরুষত্ব সহে না।"

সুলতান বলিলেন, "তোমাদের হিন্দুবীরেরা কেহই ত তোমার মত রত্নের মর্য্যাদা বুঝিল না! কাপুরুষত্ব যদি তোমাকে লাভ করিতে পারে ত তাহাই আমি পৌরুষ মনে করি।"

শক্তিকে মাঝে মাঝে এইরূপে আহত করিতে সুলতানের লাগে ভাল। তাহার গর্ব্বিত উপেক্ষাময় ভাবের ইহাই একমাত্র প্রতিশোধ।

ক্রোধে শক্তির গৌরমূর্ত্তি আরক্তিম হইয়া উঠিল। সেই পুরাতন অপমানের সহিত নূতন অপমান মিশ্রিত হইয়া তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ জ্বালাইয়া তুলিল। শক্তি ইহার কোন উত্তর দিতে পারিলেন না; কেবল ক্রুদ্ধ নিরুপায় জনের মর্ম্মোত্থিত ভীষণ অভিশাপ গণেশ-দেবের প্রতি নীরবে বর্ষিত হইতে লাগিল। গণেশদেবই তাঁহার এই অবস্থা করিয়াছেন!

সম্মুখে ফোয়ারার জলরাশি রজতোচ্ছ্বাসে ছুটিয়া ছুটিয়া নীচে নামিতেছে; নির্ঝর হ্রদে তারা ফুটিয়াছে, চাঁদ ভাসিতেছে, শক্তিময়ী ওষ্ঠাধর দৃঢ়-সংযুক্ত করিয়া ভ্রূকুঞ্চিত আরক্ত নেত্রে সেই দিকে চাহিয়া হস্তসন্নিহিত বৃক্ষের ফুলদল ছিন্ন করিতে লাগিলেন। সুল-তান শক্তির সেই চন্দ্রদীপ্ত ক্রোধোজ্জ্বল মুখকান্তির দিকে চাহিয়া চাহিয়া বলিলেন, "প্রিয়ে, এই সৌন্দর্য্যে পুড়িয়া মরিতেছি তবু দূরে যাইতে পারি না, হাজার তাড়াইলেও"। বলিয়া সোহাগভরে শক্তির মুখচুম্বন করিলেন। শক্তির পাঁচ বৎসর বিবাহ হইয়াছে, কিন্তু স্বামীর সোহাগ আদরে এখনও সে আপনাকে অভ্যস্ত করিতে পারে নাই—ইহা হইতে দূরে থাকিতে পারিলেই সে যেন ভাল থাকে। তাহার পর এখনকার এই মনের অবস্থায় ইহা তাহার বিষতুল্য বোধ হইল, সে শিহরিয়া মনে মনে গর্জ্জন করিয়া মনে

মনে বলিল,—"গণেশদেব, তুমি—তুমিই আমার এই অবস্থা করিয়াছ! ইহার প্রতিশোধের জন্তই কেবল আমার এ জীবন বহনীয়।"

এই সময় একজন দাসী একটি রোরুদ্যমান শিশুকে ক্রোড়ে করিয়া আনিয়া বলিল, "বেগমসাহেব, সাহাজাদিকে কিছুতেই ঘরে রাখিতে পারিলাম না—তাই লইয়া আনিয়াছি।"

বালিকা দাসীর ক্রোড় হইতে নামিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে মাতার নিকট আসিয়া বলিল, "আমি যাবনা—আমি তোমার কাছে থাকব!"

শক্তি দাসীকে যাইতে অনুজ্ঞা প্রদান করিয়া কন্যাকে ক্রোড়ে উঠাইয়া মুখচুম্বন করিলেন। সে তাঁহার কোল হইতে নামিয়া বলিল,—"তুমি দুষ্টু! কেন পালিয়ে এলে—আমি বাবার কাছে যাব।"

বালিকা সুলতানের কোলে বসিয়া তাঁহার গলা জড়াইয়া ধরিল।

কোমল মাতৃস্নেহে শক্তির কঠোর ভাব দ্রব হইয়া গেল, তাহার উগ্রতা করুণ নৈরাশ্যে পরিণত হইল। সে দেখিল যে,—যে তাহার কেহ নহে সেই তাহার সর্ব্বাপেক্ষা আপনার, সে তাহার স্বামী, সে তাহার কন্যার পিতা। নিজেকে শক্তি তাহা হইতে বিচ্ছিন্ন করিতে পারে, কিন্তু এই আত্মীয়তা সম্পর্ককে বিচ্ছিন্ন করিতে তাহার সাধ্য নাই। কি বিষম ভাগ্য লইয়া সে সংসারে জন্মগ্রহণ করিয়াছে!

গায়সুদ্দিন পার্শ্বের ফুলবৃক্ষ হইতে ফুল তুলিয়া কন্যার হাতে দিতেছিলেন, সে পিতার সহিত আধো-বাধো করিয়া কথা কহিতে কহিতে হাসিয়া হাসিয়া তাহা ছুঁড়িয়া ছুঁড়িয়া ফোয়ারা-হ্রদে

ফেলিতেছিল। ফুলগুলি চাঁদের কিরণে নাচিয়া নাচিয়া উঠিতে-ছিল, আর তাহার মুখটিতে হাসি ধরিতেছিল না। কচি কিশলয়ের মত অধরওষ্ঠ দুখানি হাসিতে ক্লান্ত হইয়া, প্রস্ফুটিত পুষ্পের মত মুখখানি অপরূপ লাবণ্যময় হইয়া উঠিতেছিল। শক্তি ঈর্ষাপূর্ণ স্নেহে তাহার দিকে চাহিয়া হৃদয়ে নৈরাশ্যের জ্বালা অনুভব করিতে-ছিলেন। সুলতান কন্যার মুখচুম্বন করিয়া শক্তির দিকে চাহিয়া বলিলেন, "প্রিয়তমে, আমি কি নিজের সুখের জন্যই শত্রু দমন করি? মনে কর দেখি, আমি মৃত—রাজ্য শত্রুহস্তে—তখন এই কুসুমকলিকার কি হইবে!"

শক্তি বলিল, "মনে কর দেখি এই দণ্ডে যদি এখানে বজ্রপাত হয় তাহা হইলে কি হইবে! একজন অসহায় বালকের রক্তপাত না করিলে কি তোমার রাজ্য থাকিবে না!

গায়। অসহায়তাই তাহার সহায়। বালকের পক্ষ লইয়া কত লোক বিদ্রোহী হইবে; রাজ্যে অশান্তির সীমা থাকিবে না।

শক্তি। তাই বলিয়া আগে থাকিতে নির্দ্দোষীকে বধ করিতে হইবে! ইহাই রাজকর্ত্তব্য, রাজার মত বিচার বটে। যদি বিদ্রোহ দমন করিতে চাও, যদি রাজ্য নির্ভয়ে রক্ষা করিতে চাও, তবে দোষীর দণ্ডবিধান কর। সাহেবুদ্দিনের কোন দোষ নাই; বালক প্রাণভয়ে আত্মগোপন করিয়াছে; তাহাতে তাহার দোষ নাই। কিন্তু যে তোমার আজ্ঞা তাচ্ছিল্য করিয়া তাহাকে আশ্রয় দিয়াছে, তাহার কি করিলে? দণ্ডনীয় যদি কেহ থাকে তবে সে-ই, সাহে-বুদ্দিন নহে।"

সুলতান আশ্চর্য্য হইলেন। শক্তি গণেশদেবকে যে ভাল-বাসিত তাহা তিনি জানিতেন, সে ভালবাসা যে তাহার হৃদয়

হইতে একেবারে মুছে নাই—ইহাই তাঁহার বিশ্বাস। সুতরাং তাহার মুখে এ কথা শুনিয়া আশ্চর্য্য হইলেন। স্ত্রীলোকের ভালবাসা এবং প্রতিশোধ-স্পৃহার ব্যবধানটুকু কোথায় বুঝিয়া উঠিতে পারিলেন না। কিন্তু মনে মনে সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন, "গণেশদেব বন্দী।"

"বন্দী?"

"হ্যা।"

বালিকা ইহা শুনিয়া বলিল, "গণেশ!—সে আমি ভেঙ্গে ফেলেছি! আমাকে সুন্দরলাল দিয়েছিল—বিশ্রী!"

সুন্দরলাল এই উদ্যানের মালী।

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ।

কুতবের বুদ্ধিতে সাহেবুদ্দিনের প্রাণদণ্ডই যুক্তিসিদ্ধ, শত্রুর জড় রাখা কিছু নয়। বাদসাহের শুভাকাঙ্ক্ষা করিয়া কুতব তাঁহাকে এই পরামর্শ দিতেছে। সভাসদগণ কেহই এ কথা জানে না, বালক সাহেবুদ্দিনের জন্য কাতর হইয়া তাহারা কুতবকেই ধরিয়া পড়িয়াছে যে তিনি সুলতানকে বলিয়া রাজপুত্রের প্রাণ রক্ষা করুন। সভাসদগণের বিশ্বাস বাদসাহ যদি কাহারও কথা রাখেন তবে কুতবের কথাই রাখিবেন—অবশ্য নূতন রাণীর কথা ছাড়া। পাঠকও জানেন তাহাদের এই বিশ্বাস নিতান্ত অমূলক নহে।

কুতব সভাসদগণের কথা শোনে—শুনিয়া অর্থপূর্ণ ভঙ্গীতে মাথা নাড়িয়া বলে, "আগের দিন কি আছে যে কুতবের কথা আর সুলতানের কাজ একই হইবে! এইত দেখিলে সপ্ত রাজপুত্রের প্রাণবধ হইল, কুতব কি তাহা নিবারণ করিতে পারিল?"

আজিম খাঁ লোকটা সরল-হৃদয়, মুক্তকণ্ঠ, অন্যায়অসহিষ্ণু, অযথা অত্যাচারের বিরোধী। ইহার উপর আবার সে সাহেবুদ্দিনের নিকট আপনার প্রাণরক্ষার জন্য ঋণী, কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ, সুতরাং এরূপ কথায় তাহার ক্রোধের আর সীমা থাকে না, সে ক্রোধোত্তেজিত ভীষণ হইয়া বলে, "সুলতান সেকন্দর সাহের বিদ্রোহী হইয়া আমরা যে গায়সুদ্দিনকে সিংহাসনে বসাইলাম, সে কি কেবল আবার যথেচ্ছাচার সহ্য করিবার জন্য? যদি সাহেবুদ্দিনকে বাদসাহ মুক্তি প্রদান না করেন তবে আবার যুদ্ধ বাধিবে। আর কেহ অস্ত্র না ধরে কুমারের জন্য এই হাত অস্ত্র ধরিবে।"

এই কথায় কুতব নৈরাশ্যের স্বরে বলিয়া ওঠে, "তাহাতে রাজপুত্র বাঁচিবেন না, মরিবে কেবল তুমি। রাজার রাজ্য আর নাই, এ সয়তানীর রাজ্য!"

অন্যেরা কুতবের কথার সত্যতা হৃদয়ঙ্গম করিয়া রাজপুত্রের ভাগ্য পরিণাম কল্পনা করিয়া শিহরিয়া উঠে, এবং অন্য কোন কথা না বলিয়া সমস্বরে কুতবের শেষ বাক্যের প্রতিধ্বনি তুলিয়া গায়সুদ্দিনের অন্যায়াচরণের জন্য নূতন রাণীকে অভিসম্পাতিত করে। শক্তির বিবাহের পর হইতে, সয়তানী বেগম, রাক্ষসী রাণী, বাঘিনী মহিষী প্রভৃতি তাহার এমনতর অনেক নূতন নামকরণ হইয়াছে। বলা বাহুল্য কুতবই তাঁহার এই সকল সুনাম

রটনার মূল। প্রথমতঃ, যা শক্র পরে পরে—কুতবের মন্ত্রণায় যে সকল মন্দ কাজ হয় সে তাহা রাণীর ঘাড়ে চাপাইয়া নিজে নিষ্কলঙ্ক থাকিতে চাহে। দ্বিতীয়তঃ এবং প্রধানতঃ, রাণীর নিন্দা রটনা করিয়া সে সুখ অনুভব করে। সে ভাবে রাণী তাহার প্রতিদ্বন্দ্বী, তাই সে তাঁহাকে বিষ নয়নে দেখে। কুতবের বিশ্বাস—শক্তি আসিবার পূর্ব্বে সে যেমন রাজার সর্ব্বেসর্ব্বা ছিল এখন আর সে তাহা নাই, তাহার আসনে এখন শক্তি প্রতিষ্ঠিত, সে তাঁহার নীচে পড়িয়াছে। শক্তির সহিত রাজার বিবাহ ঘটাইয়া সে নিজের পায়ে নিজেই কুঠার মারিয়াছে। কুতবের এরূপ ঈর্ষার যে বাস্তবিক কোন সঙ্গত কারণ আছে, তাহা যদিও নহে। পূর্ব্বের ন্যায় এখনও কুতব সুলতানের দক্ষিণ হস্ত, বস্তুতঃ তিনি কুতবের দ্বারাই চালিত। তাহার প্রধান কারণ, রাজাকে বশ করিতে রাণীর কোন চেষ্টাই নাই। রাণী দৈবাৎ রাজার কার্য্যাকার্য্যের দিকে চাহিয়া দেখেন, দৈবাৎ তাঁহাকে কোন অনুরোধ উপরোধ করেন। কিন্তু হইলে কি হয়, রাজা যদি কোন সামান্য বিষয়ে কুতবের কথা অমান্য করেন তবে কুতব রাণীকে তাহার মূলে বুঝিয়া তাঁহার প্রতি আন্তরিক চটে। সম্প্রতি উপর্য্যুপরি এমন কয়েকটা ঘটনা ঘটিয়াছে যাহাতে তাহার এই ঈর্ষা মহা প্রবল হইয়া উঠিয়াছে। কিছুদিন পূর্ব্বে কয়েকজন গরীব প্রজা খাজনা দিতে না পারায় কুতবের আজ্ঞায় তাহাদিগকে রাজবাটির নিকটস্থ এক গাছে বাঁধিয়া বেত্রাঘাত করা হইতেছিল। রাজকুমারী গুলবাহার বহির্বাটীর বারেন্দা হইতে তাহা দেখিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে মাতার নিকট গিয়া সেই কথা বলে। শক্তি ইহাতে রাজাকে ধিক্কার প্রদান করিয়া তাহাদিগকে রাজ

সরকারে চাকরী প্রদান করান। তাহাদের মধ্যেই একজন অন্তঃপুরের বাগানের নূতন মালী সুন্দরলাল। কুতবের ইহাতে ক্ষোভের সীমা নাই। কিন্তু পরিপক্কবুদ্ধি সুচতুর সভাসদ হইলে যেরূপ হইয়া থাকে, কুতব নিজের যথার্থ মনোভাব গোপন করিয়া রাজার নিকট রাণীর করুণার প্রশংসাই করিল, আর সভাসদ ও সেই গরীব প্রজাদিগকে কৌশলে জানাইয়া দিল যে কুতবের অনুগ্রহেই কেবল বেচারাগণের অনাহতি ঘটিল, নহিলে রাক্ষসী রাণীর কৃপায় তাহাদের হাড় মাংস একত্রে থাকিত না।

কুতব দেখিল রাজকুমারী বাহিরে আসিলে অনেক বিপদ। এই ভয়ে তাহাকে সর্ব্বদা মহা শঙ্কিত থাকিতে হয়। রাজার সহিত হয়ত সে গোপনীয় কথা কহিতেছে এমন সময় রাজকুমারী আসিয়া উপস্থিত হইয়া কোন কথা কখন শুনিয়া গিয়া রাণীর নিকট বলিয়া হুলস্থূল বাধাইবে তাহার ঠিক কি। এই আশঙ্কায় সে একদিন রাজাকে বলিল, "সাহাজাদী এখন বড় হইতেছেন এখন তাঁহাকে অন্তঃপুরবদ্ধা করাই ভাল; নহিলে রাজ কায়দা বজায় থাকে না।" রাজা কুতবের সহিত এক মত হইলেন, অথচ কার্য্যতঃ সাহাজাদীর বাহিরে আসা বন্ধ হইল না। কুতব বুঝিল কাহার হাতে কলকাটি। কুতব মনে মনে চটিল; তবে কি করিবে নীরবে তাহা সহিয়া গেল। কিন্তু সহিবারও ত একটা সীমা আছে। কুতব যখন দেখিল রাজনৈতিক বিষয়েও রাণী ইচ্ছা করিলে রাজাকে চালিত করিতে পারেন, সেখানেও কুতব কেহ নহে; তখন সে ইহার প্রতিকারে কৃতসঙ্কল্প হইল। পূর্ব্বেই বলিয়াছি কুতবের পরামর্শে সাহেবুদ্দিনের প্রাণদণ্ড হওয়াই কর্ত্তব্য, রাজাও তাহাতে রাজি; কোন দিন ফাঁসি হইবে তাহাই স্থির করিয়া

কেবল হুকুম দেওয়া মাত্র বাকী। ইহার মধ্যে রাজা কুতবকে ডাকিয়া একদিন বলিলেন, "কুতব, তাহাতে আর কাজ নাই—সাহেবুদ্দিনকে মাপ করা যাউক"।

কুতব আত্মসংবরণে অক্ষম হইয়া বলিল,"ইহা আপনার বুদ্ধি না অপর কাহারো? সাহেবুদ্দিন আপনার জ্যেষ্ঠের পুত্র, প্রকৃত রাজ্যাধিকারী—এ কথা মনে রাখিবেন।" গায়সুদ্দিন বলিলেন, "রাজ্য আমার, ধন আমার, সৈন্য আমার, সে একা বিপক্ষ হইয়া আমার কি করিবে? সে বিদ্রোহী হইলে আমার ক্ষতি নাই—ক্ষতি তাহারি!"

কুতব বলিল, "আর গণেশদেব—তিনিও কি মাপ পাইবেন?"

রাজা বলিলেন, "যদি শপথ করেন যে জীবনে কখনো কোন অবস্থায় আমার বিপক্ষ না হইয়া পক্ষ থাকিবেন, তাহা হইলে তাঁহাকেও মুক্তি প্রদান করিব। গণেশদেব একবার কথা দিলে যে তাহা ভঙ্গ করিবেন না তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই।

কুতব। যদি কথা না দেন?

রাজা। তাহা হইলে প্রাণদণ্ড হইবে। গণেশদেবের সহায়তার উপরেই সাহেবুদ্দিনের নির্ভর। শপথে হউক, মৃত্যুতে হউক, গণেশদেব নিরস্ত হইলে সাহেবুদ্দিনকে আর কোনও ভয় নাই। তাহাকে অনায়াসে তখন মুক্তি দেওয়া যাইতে পারে। বিশেষ সেই হত্যাকাণ্ডে আমার যেরূপ অপযশ হইয়াছে সাহেবুদ্দিনকে মুক্তি দিলে সে কলঙ্কও অনেক পরিমাণে ক্ষালিত হইবে।

কুতব বুঝিল সুলতান মন্দ কথা বলিতেছেন না। অন্য সময় হইলে সে রাজবুদ্ধিকে তারিফ করিয়া তাঁহার সহিত একমত হইত। কিন্তু ইহা রাণীর পরামর্শ জানে ক্ষুব্ধ হইয়া বলিল, "বালক বড়

হইলে ঢের গণেশদেব তাহার পক্ষ হইবে। তবে আপনার মঙ্গল আপনি ভাল বোঝেন, আমাদের অধিক কথা কহা নিষ্প্রয়োজন।”

কুতবের মনে এতদিন ঈর্ষার যে অগ্নি ধূমায়িত হইতেছিল এই ঘটনার পর হইতে তাহা বিষম প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। রাণীর নিন্দা রটনা করিয়াই আর সে তৃপ্ত থাকিতে পারিল না; তাঁহার প্রভাব খর্ব্ব করিয়া তাঁহাকে জব্দ করিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিল। ভাগ্যও অতি শীঘ্র তাহার এই মনস্কামনা পূর্ণ করিবার অবসর ঘটাইয়া দিল।

সেক্ষপীর যে তাঁহার কাব্য জগতেই কেবল একটি মাত্র আয়াগোর সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন এমন নহে, সত্য জগতে এমন অনেক আয়াগো আছে। কুতবের আন্তরিক ভাব রাণী কিছুই জানেন না বরং তাঁহার ধারণা বিপরীতই। তিনি জানেন কুতব তাঁহার পরম বন্ধু। তিনি কুতবের সাহায্যেই সন্ন্যাসিনী সাজে অন্তঃপুর ছাড়িয়া গণেশদেবের সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারিয়াছিলেন। কুতব যে তখন তাঁহার সহায়তা করে তাহার প্রধান কারণ, তাহার ইচ্ছা ছিল শক্তি আর না ফেরেন। দ্বিতীয়তঃ, যদি বা ফেরেন তাহা হইলেও এই উপকারে একদিকে রাণী হাতে রহিলেন, অন্য দিকে আবশ্যক হইলে ইহা ব্যক্ত করিয়া রাণীর সর্ব্বনাশ সাধনের উপায়ও রহিল। এখন সে ভাবিতে লাগিল, আপনার দোষ টুকু ঢাকিয়া কিরূপ কৌশলে রাজাকে সেই কথা জানাইয়া রাণীকে অপদস্থ করে। কিন্তু সহসা ভাগ্যবলে আপনা হইতে আর এক নূতন উপায় আসিয়া জুটিল, আর তাহার সে পুরাতন ঘটনা অবলম্বন করিতে হইল না। রাণী কুতবকে ডাকিয়া বলিলেন, কারাগারে গণেশদেবের সহিত একবার দেখা করিতে চাহেন।

এইখানে বলা উচিত কুতব সেই শ্রেণীর লোক যাহাদের রাজ-অন্তঃপুরে গমনাগমনের বাধা নাই। রাণীর কথা শুনিয়া কুতব তাঁহাকে জানাইল,—"অবশ্যই কুতব সে সুযোগ ঘটাইবে। রাণীর ইচ্ছা পূর্ণ করিতে সে জীবন দিতে পারে, আর ইহা ত অতি সামান্য কথা!"

ঊনত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

শক্তির আজ সন্ন্যাসিনী সাজ নহে, রাজরাজেশ্বরী বেশ। বিবাহের পর পাঠক তাহাকে ক্ষণকালের জন্য যেরূপ মণিময় সজ্জায় সজ্জিত দেখিয়াছিলেন, আজ সেই সাজে সে গণেশদেবকে দেখা দিতে আসিয়াছে। আজ সে বাল্যসখা প্রিয়তম রাজকুমারকে দেখিতে আসে নাই; চিরশত্রু বিরাগভাজন, ঘৃণার পাত্র গণেশ-দেবকে স্বপ্রভাব দেখাইতে আসিয়াছে! তিনি শক্তিকে প্রত্যাখ্যাত করিয়া যে ভালই করিয়াছেন, সেই জন্যই যে আজ সে সামান্য সামন্তরাণীর পরিবর্ত্তে রাজরাজেশ্বরী সুলতানা,—একদিন যে তাঁহার অনুগ্রহের ভিখারিণী দীনহীন নারী ছিল, ভাগ্যক্রমে সেই যে আজ তাঁহার প্রভু, ভাগ্যনিয়ন্তা—ইহাই সে দেখাইতে আসিয়াছে, তাঁহাকে দেখিতে আসে নাই। তাহার বাল্যপ্রেম বাল্যস্মৃতি এখন লজ্জার বিষয়, অপমানের কথা—জলন্ত প্রতি-শোধে সে তাহা ভস্ম করিতে চাহে, প্রতিশোধই এখন তাহার প্রাণের সুখ, জীবনের তৃপ্তি। তাই সে তাহার সুখশান্তিহারী

শত্রুকে নিজের মুখে মৃত্যুদণ্ড জ্ঞাপন করিয়া আপনার ক্ষমতা দেখাইতে আসিয়াছে!

কারাগার। মুক্তবাতায়ন পথে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া গণেশদেব কঠোর ভূমিশয্যায় শয়ান আছেন। সন্ধ্যাকালে বাদশাহের নিকট হইতে তাঁহার মুক্তির প্রস্তাব আসিয়াছিল। প্রস্তাবের মর্ম্ম এই, কোন সূত্রে কখনও গণেশদেব বাদসাহের প্রতিকূলাচরণ না-করিয়া যদি ন্যায়ান্যায় অবিচারে তাঁহার পক্ষাবলম্বন করিতে শপথ করেন; তাহা হইলে সুলতান তাঁহাকে মুক্তি প্রদান করিবেন।

গণেশদেব রাজানুগ্রহ অগ্রাহ্য করিয়াছেন। এইরূপ চিরদাসত্বে আপনাকে বদ্ধ করা অপেক্ষা মৃত্যুও তাঁহার বরণীয়। সেই ঘৃণিত প্রস্তাব মনে করিয়া এখন পর্য্যন্তও মাঝে মাঝে তিনি ক্রোধ-কম্পিত হইয়া উঠিতেছেন; আবার মাঝে মাঝে প্রিয়বিচ্ছিন্ন মুমূর্ষু ব্যক্তির কাতরতা সেই ক্রোধের স্থান গ্রহণ করিতেছে। রাজার মরিতে দুঃখ নাই, ন্যায়ের জন্য প্রাণ দিতে তিনি কাতর নহেন; কিন্তু তিনি মরিলে তাঁহার আত্মীয়স্বজনের কিরূপ দুর্দ্দশা ঘটিবে, ইহা ভাবিয়া তাঁহার যন্ত্রনা-পীড়িত হৃদয়ে আর্ত্তনাদ উত্থিত হইতেছে। শেষ সময়ে একবার কাহারও সহিত দেখা পর্য্যন্ত হইল না, এমন বন্ধুও কেহ নাই যাহাকে তাহাদের সম্বন্ধে কোন একটি কথা পর্য্যন্ত বলিয়া যাইতে পারেন! গণেশদেব যতই এই নৈরাশ্যবেদনা গভীররূপে অনুভব করিতেছেন ততই মৃত্যুর সমীপবর্ত্তী হইয়াও মৃত্যুতে অবিশ্বাস, এবং ঈশ্বরের ন্যায়বিচারের উপর বিশ্বাস জন্মিতেছে। তাঁহার মনে হইতেছে কোন ঐশীশক্তি-প্রভাবে এখনি কারাগারের কঠিন দেয়াল দ্বিধাযুক্ত হইয়া তাঁহাকে মুক্তিপ্রদান করিবে।

এই বিশ্বাসে উন্নীত উত্তেজিত আত্মহারা হইয়া গণেশদেব সবলে সহসা দেয়ালে মুষ্ট্যাঘাত করিলেন। কঠিন দেয়াল ভাঙ্গিল না, টলিল না ; যেমন ছিল তেমনি রহিল, তিনি কেবল হাতে বেদনা অনুভব করিয়া আত্মস্থ হইলেন। তাঁহার মুখে হাসির রেখা দেখা দিল। তিনি কি পাগল হইয়াছেন ! তাঁহার মুষ্ট্যাঘাতে দেয়াল ভাঙ্গিবে ! এ সময়ে তাঁহার সন্ন্যাসিনীকে মনে পড়িল। তিনি কি রাজার জীবন সম্বন্ধে নিশ্চেষ্ট আছেন ! তাহা হইতেই পারে না। অবশ্য গণেশদেব মুক্তিলাভ করিবেন, ন্যায়ের জন্য কার্য্য করিয়া কখনই তিনি জীবন হারাইবেন না। সহসা শক্তিকে মনে পড়িয়া অনুতাপের দংশনে হৃদয় জ্বলিয়া উঠিল। তিনি শক্তির সম্বন্ধে যে অন্যায় করিয়াছেন এ সমস্তই তাহার ফল! তাঁহার আশা ভরষা সমস্তই বিদূরিত হইল, তিনি বুঝিলেন তাঁহার মৃত্যু অনিবার্য্য! বিশ্বাসের উত্তেজনা ক্রমে নৈরাশ্যের ক্লান্তিতে পরিণত হইয়া তাঁহার শ্রান্ত নয়নে তন্দ্রা আনয়ন করিল। তিনি স্বপ্ন দেখিলেন— চতুষ্পার্শ্বে আর দেয়ালের বাধা নাই, মস্তক-দেশ অবারিত, তিনি মুক্ত শ্যামল ক্ষেত্রে নক্ষত্র-খচিত আকাশতলে দণ্ডায়মান, সম্মুখে এক জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী বিরাজিত। অপূর্ব্ব আনন্দে তাঁহার হৃদয় পূর্ণ হইল, তিনি দেবীকে প্রণাম করিয়া উঠিতে যাইবেন এমন সময়ে সহসা দ্বারোদ্ঘাটন শব্দে তাঁহার নিদ্রা ভঙ্গ হইল। নয়ন উন্মীলিত করিয়া দেখিলেন, সত্যই পরিচ্ছদের মণিময় কান্তিতে অন্ধকার গৃহ উজ্জ্বল করিয়া গৃহদ্বারে এক রমণীমূর্ত্তি দণ্ডায়মান,—স্বপ্নে সত্যে মিশিয়া গণেশদেবের হৃদয় আশাপূর্ণ বিস্ময়জনক অপরূপ ভাবে পূর্ণ হইয়া উঠিল।

ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

শক্তি কারাপ্রবেশ করিয়া প্রথমে অন্ধকারে কিছুই দেখিতে পাইল না। দ্বার-রক্ষককে দীপ আনিতে আজ্ঞা দিয়া সেই খানেই মুদ্রিতনয়নে দাঁড়াইয়া রহিল। কিছু পরে নয়ন মেলিয়া আর তেমন অন্ধকার দেখিল না। গবাক্ষ পথ দিয়া কক্ষে যে টুক আলোক আসিতেছিল তাহাতেই শক্তি দেখিতে পাইল গণেশদেব কোথায়। সে অগ্রসর হইয়া তাঁহার নিকটবর্ত্তী হইল। গণেশদেব বিস্ময়ে উঠিয়া বসিয়া বলিলেন, "শক্তি ?" স্বরে শক্তিকে তিনি চিনিয়াছিলেন।

শক্তি কঠোর তীব্রস্বরে উত্তর করিল,"শক্তি নহে, সুলতানা।"

কারাগৃহের পাষাণ দেয়ালের অণু পরমাণু পর্য্যন্ত যেন সেই রুদ্রবাক্যে আহত কম্পিত হইয়া উঠিল, গণেশদেব স্তব্ধ নির্ব্বাক হইয়া পড়িলেন, শক্তিও স্তব্ধ হইয়া রহিল। কিন্তু কথা কহিবার অনিচ্ছাবশতঃ নহে,—শক্তি নিস্তব্ধে তীব্র দৃষ্টিতে অন্ধকার ভেদ করিয়া গণেশদেবের মুখ নিরীক্ষণ করিতে চেষ্টা করিল। তাহার কথায় গণেশদেবের মনের ভাব কিরূপ হইল তাহা বুঝিতে চেষ্টা করাই শক্তির অভিপ্রায়। কিন্তু তাহার প্রয়াস নিষ্ফল হইল, শক্তির ইচ্ছায় অন্ধকার দীপ্ত হইল না; রাজমূর্ত্তি যেমন অস্পষ্ট তেমনই রহিল।

সহসা শক্তির উৎসুক দৃষ্টির সমক্ষে গণেশদেব সুস্পষ্ট প্রকাশিত হইলেন। দ্বাররক্ষক গৃহ দীপালোকিত করিয়া দ্বার রুদ্ধ

করিয়া চলিয়া গেল। শক্তি তখন দেখিল এতদিন সে যে গণেশদেবকে চিনিত ইনি সে গণেশদেব নহেন। এ মূর্ত্তি সেই রাজবেশী অনুপম কান্তিময় সুসজ্জিত মোহন মূর্ত্তি নহে। ছিন্ন, মলিনবস্ত্রধারী, রুক্ষ লম্বিতকেশ, ক্ষাণশুষ্ক বিবর্ণ মুখ, এক দীনহীন বন্দী তাহার সম্মুখে আসীন। বন্দীর কেশপাশে অৰ্দ্ধাচ্ছন্ন কোটর-প্রবিষ্ট চক্ষু হইতে যদি না তাঁহার পূর্ব্ব-প্রভাব পূর্ব্ব-জ্যোতি বিভাসিত হইত তাহা হইলে ইঁহাকে গণেশদেব মনে করা শক্তির পক্ষেও সুকঠিন হইত।

শক্তি নিস্পন্দনেত্রে গণেশদেবকে দেখিতে লাগিল। তাহার মুখের মাংসপেশী এমন অটল অপরিবর্ত্তিত ভাব ধারণ করিল এমন নিষ্কম্প নিস্তব্ধ হইয়া সে দাঁড়াইয়া রহিল যে রাজাকে দেখিয়া তখন তাহার মনে কিরূপ ভাবোদয় হইতেছে, রাজার দুর্দ্দশায় সে সুখ বা দুঃখ অনুভব করিতেছে তাহার মূর্ত্তি হইতে ইহা বুঝিয়া উঠা একজন পারদর্শী মনোভাববেত্তার পক্ষেও দুঃসাধ্য হইত। কিন্তু অল্পক্ষণের মধ্যেই তাহার সে নিস্পন্দভাব শিথিল হইয়া আসিল, মুখে বর্ণ পরিবর্ত্তন ঘটিল, নয়নে দুই বিন্দু অশ্রু দেখা দিল, ওষ্ঠাধর ঈষৎ কম্পিত হইয়া উঠিল। সহসা জড় শক্তি জীবন্ত মানবীরূপ ধারণ করিল। তাহার এই নবপ্রাণিত অপূর্ব্ব মূর্ত্তিতে কি প্রতিশোধতৃপ্তিজনিত প্রফুল্লতা প্রকাশ পাইতেছে? এ অশ্রু কি তাহার ঈর্ষাবিগলিত আনন্দাশ্রু? না, তাহা নহে। শক্তি আজ নিঃস্বার্থ করুণাময় প্রেমে আত্মহারা, পাষাণে আজ সহসা করুণাধারা বহিয়াছে। সম্পদশালী নিরভাব গণেশদেব এতদিন যাহা করিতে পারেন নাই আজ দীনহীন গণেশদেব তাহা করিয়াছেন। পূর্ব্বে গণেশদেবকে শক্তির দান করিবার কিছুই ছিল

না, সে তখন ভিখারিণী, তিনি রাজাধিরাজ। তাই তাঁহাকে ভাল-বাসিয়াও শক্তির প্রেম পূর্ণবিকশিত হইয়া উঠে নাই। আত্মদানেই প্রেমের সম্পূর্ণতা, যে প্রেমে তাহার অবসর পর্য্যন্ত ঘটে নাই সে প্রেমের অপূর্ণতা, ক্ষুণ্ণতা কিরূপে পূরিবে? তাই রাজাধিরাজ মহাপ্রতাপ গণেশদেব শক্তির হৃদয়ে প্রেমভাব উদ্রেক করিয়াও সে প্রেমের স্বার্থপূর্ণ মলিনতা দূর করিতে পারেন নাই। আজ বিপন্ন বন্দী গণেশদেব শক্তির অন্তরে নারীর মহাপ্রেম জাগরিত করিয়া তাহার জীবন, তাহার সুখ, তাহার মানবত্ব পূর্ণ করিয়াছেন। সে এখন ঈর্ষা প্রতিশোধের অতীত। সন্ন্যাসিনী বহু পূর্ব্বে তাহাকে যাহা বলিয়াছিলেন, নিঃস্বার্থ প্রেমে মগ্ন হইয়া সে এখন সেই কথার সত্যতা উপলব্ধি করিতেছে।

শক্তি কিছু পরে বলিল, "রাজকুমার, ওঠ!" এই স্বর আর ইহার কিছু পূর্ব্বের সেই স্বরে কি প্রভেদ! একই কণ্ঠ হইতে কি ইহা নির্গত হইয়াছে—সেই কঠোর রুদ্রধ্বনি আর এই কোমল করুণ বাণী? রাজকুমারের নিকট সমস্তই রহস্যময় প্রহেলিকা বলিয়া মনে হইল, তিনি বিস্ময়ে নিরুত্তর হইয়া রহিলেন।

গণেশদেব, তুমি পুরুষ! নারীর প্রকৃতি তুমি কি বুঝিবে? তোমাদের মধ্যে জ্ঞানী যাঁহারা তাঁহারা পর্য্যন্ত যখন নারী-হৃদয়ের রহস্য ভঙ্গ করিতে না পারিয়া বলিয়া গিয়াছেন, "দেবা ন জানন্তি কুতো মনুষ্যাঃ!' তখন শক্তি যে তোমার নিকট অবোধগম্য হইবে ইহা আর আশ্চর্য্যের বিষয় কি!

রাজাকে নিরুত্তর দেখিয়া শক্তি আবার বলিল, "রাজকুমার, সময় বহিয়া যায়,—ওঠ! আমার এই অঙ্গাবরণে বেশ ভাল করিয়া আপনাকে আবরিত কর।"

রাজকুমার তাহার অভিপ্রায় বুঝিলেন, তাঁহার স্বপ্ন তবে সত্য! শক্তি তাঁহাকে মুক্তি প্রদান করিতে আসিয়াছে! আবার আপনাকে মুক্তক্ষেত্রে প্রশস্ত আকাশতলে দণ্ডায়মান দেখিলেন, আত্মীয়স্বজনের আনন্দবিভাসিত মুখমণ্ডলী আপনার চারিদিকে দেখিতে পাইলেন, বন্ধনশূন্য স্বাধীনতার আনন্দে, প্রিয়জনমিলনজনিত অনুপম সুখে হৃদয় ভরিয়া উঠিল, তিনি আত্মহারা ভাবে কলের পুতুলের মত উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন,"কোথায় যাইব?"

শক্তি দীপ নির্ব্বাপিত করিয়া তাহার বহুহস্তবিলম্বিত পরিধেয়ের কিয়দংশে স্বদেহ আবরিত রাখিয়া অন্যাংশ ছিন্ন করিয়া তাহা, এবং তাহার মস্তকাবরণ সুবর্ণখচিত শাল রাজহস্তে দিয়া বলিল, "এই লও, এই বস্ত্র ও শালে আপনাকে আচ্ছাদন করিয়া দ্বারে আঘাত কর, প্রহরী দ্বার খুলিয়া দিলে নিস্তব্ধে তাহার সহিত চলিয়া যাইও, কারাগারের বাহিরে পৌছিয়া সেখানকার প্রহরীকে এই অঙ্গুরীটি দিও, আংটি লইয়া সে চলিয়া যাইবে, তুমি যথা ইচ্ছা পলায়ন করিতে পারিবে।"

রাজা কাষ্ঠ-পুত্তলির ন্যায় বলিলেন, "আর তুমি?"

শক্তি। সে ভাবনা তোমার নাই। কথা আছে কিছু পরে কুতব আসিয়া আমাকে লইয়া যাইবে।

রাজ। কিন্তু প্রহরী ভাবিবে তুমিই চলিয়া গিয়াছ, কুতব আসিলে সে তাহাই বলিবে।

শক্তি। যে প্রহরী তোমার সঙ্গে যাইতেছে তাহার পাহারা তখন ফুরাইবে,—তাহার স্থলে যে নূতন প্রহরী আসিবে সে কি করিয়া জানিবে আমি আছি কি গিয়াছি?

রাজা। এ প্রহরীর নিকট সে সমস্ত শুনিবে।

শক্তি। না, তাহা বারণ। তুমি এই বেলা যাও, নহিলে সমস্ত গোল হইয়া যাইবে।

শক্তি সমস্ত কথাই সত্য বলিলনা। শক্তি যে আদর্শ ন্যায়বাদী বা সত্যবাদী এমন কথা আমরা কখনও বলি নাই, এখনো বলিতেছি না; দোষে গুণে সে মানুষ মাত্র। রাজাকে মুক্তি দেওয়াই এখন তাহার অভিপ্রায়, এই উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য সে মিথ্যা বলিতে কিছুমাত্র সঙ্কোচ করিল না! রাজা বুঝিলেন শক্তির জন্য তাঁহার ভাবিবার কিছু নাই, তিনি এখন নির্ভাবনায় অসঙ্কোচে পলায়ন করিতে পারেন। গণেশদেব শক্তিদত্ত বস্ত্র ও শাল হস্তে লইয়া আশার বলে বলী হইয়া উঠিলেন। কারানির্গত না হইয়াই স্বাধীনতার সুখে তাঁহার হৃদয় পূর্ণ হইয়া উঠিল। তিনি দেখিলেন, তিনি আর বদ্ধ অসহায় বন্দী নহেন; তিনি অত্যাচার নিবারণে সপারগ পুরুষ গণেশদেব। আনন্দস্রোত তাঁহার হৃদয়ে বহিয়া যাইতে লাগিল। কিন্তু তিনি যেন স্বপ্ন দেখিতেছিলেন, স্বপ্নের আনন্দ সহসা জাগ্রতে বিলীন হইল। তিনি মুহূর্ত্তে আত্মস্থ হইয়া বলিলেন, "না, শক্তি, আমি যাইব না—এই লও তোমার বস্ত্র।"

শক্তি আহত আশ্চর্য্য হইয়া বলিল, "কেন?"

গণেশদেব বলিলেন, "তোমার হাত হইতে মুক্তি গ্রহণ করিবার অধিকার আমার নাই; আমি পলায়ন করিব না।"

অটল দৃঢ়স্বরে গণেশদেব এই কথা বলিলেন। শক্তি বুঝিল ইহার অন্যথা করা তাহার অসাধ্য। শক্তির আশাপ্রদীপ্ত মুখমণ্ডল সহসা ভস্মের মত মলিন হইয়া পড়িল; ভূতলে পতন নিবারণের জন্য তাহাকে দেয়ালের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইল।

একত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

বাদসাহ বলিলেন, "সত্য বলিতেছ? সত্য—সত্য!"

কুতব বলিল, "অপ্রত্যয় জন্মে নিজে চলুন, আপনার চক্ষু আপনাকে মিথ্যা বলিবে না!"

বাদ। বুঝিয়াছি আর দেখিতে হইবে না! ঠিক, ঠিক! তুমি যাও, এখনি যাও, তাহার ছিন্নমুণ্ড আমাকে আনিয়া দেখাইতে বল, যাও, কুতব, এখনি যাও।—

কুতব। কাহার মুণ্ড?—

বাদ। কাহার মুণ্ড? সেই নরাধম গণেশদেবের!

কুতব। আর—আর—বেগমসাহেবকে কি বলিব?

বাদসাহ ক্রুদ্ধস্বরে বলিলেন, "বেগমসাহেবকে তোমার কিছুই বলিতে হইবে না—তাঁহার সহিত বোঝাপড়া আমার, অন্যের সে সম্বন্ধে কিছু করিতে হইবে না।"

কুতব ক্ষুণ্ণ হইল। সে মনে করিয়াছিল গণেশদেবকে দেখিতে গিয়াছেন শুনিলে বাদসাহ শক্তির যে শাস্তি বিধান করিবেন তাহাতে আর তাঁহাকে রাজবাটী মুখে ফিরিতে হইবে না। কুতব হতাশহৃদয়ে নতমুখে অভিবাদন করিয়া রাজাজ্ঞা-পালনোদ্দেশে গমন করিল।

বাদসাহ আর একবার ডাকিয়া বলিলেন, "শোন, কুতব, বেগমসাহেব কারাগার হইতে চলিয়া না আসিলে যেন গণেশদেবকে হত্যা করা না হয়। বুঝিলে ত?"

কুতব বলিল, "যো হুকুম।"

দ্বাত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

শক্তি চিরদিন আশায় নিরাশ হইয়াছে, কখনও সুখ চাহিয়া পায় নাই। কিন্তু আজ অন্যকে সুখ-শান্তি দান করিতে গিয়াও যখন সে ব্যর্থ-মনোরথ হইল, তাহার পরিপূর্ণ হৃদয়-উথলিত নিঃস্বার্থ সহানুভূতি পর্য্যন্ত যখন গণেশদেব অগ্রাহ্য অবহেলা করিলেন, তখন তাহার যে কষ্ট হইল তাহা এই দুঃখপূর্ণ সংসারেও কদাচ ঘটে। ইহা তাহার পূর্ব্বের প্রতিশোধ-উত্তেজনামিশ্রিত, ক্রোধতরঙ্গসিক্ত অপেক্ষাকৃত লঘুভার মিশ্র নৈরাশ্য নহে,—প্রতিশোধহীন, উত্তেজনাহীন, অমিশ্রিত, অকল্পিত জমাট দুঃখের লৌহ-কবাটনিষ্পেষিত হইয়া তাহার সমস্ত প্রকৃতি যেন মুহূর্ত্তে প্রলয়ের ধূমকেতুর ন্যায় উচ্ছৃঙ্খল, অপ্রকৃত, উৎক্ষিপ্ত হইয়া বিশ্বজীবনের সহিত এক-সূত্রতা, একাত্মানুভূতি হারাইল।

কারাগৃহের বাহিরে আসিয়া শক্তি দেখিল আকাশে একটিও তারকা নাই, রজনীর অন্ধকার মেঘের অন্ধকারে ঘনীভূত। সে নিস্তব্ধ নিশ্চল হইয়া রহিল। চারিদিকের অবস্থা প্রকৃতরূপ উপলব্ধি করিতে পারিল না, নিজের অবস্থাও ঠিক বুঝিয়া উঠিতে পারিল না, আপনাকে একটা অস্তিত্বহীন, মহাশূন্য, অন্ধকার রাত্রি বলিয়া বিভ্রম জন্মিতে লাগিল। শক্তিকে নিস্তব্ধভাবে দণ্ডায়মান দেখিয়া প্রহরী ভাবিল, বুঝি অন্ধকারে চলিতে ভয় পাইতেছেন। সে বলিল, "আঁধারামে ডর মালুম দেতা, রোস্‌নাই লাওয়ে ?"

চকিতে শক্তির মোহ ভাঙ্গিয়া গেল। ধীরে ধীরে বলিলেন, "না, চল যাইতেছি।"

কারাগারের বহির্সীমার দ্বারদেশে জমাদার গোলাম আলি খাঁ মুড়িসুড়ি দিয়া কাষ্ঠতক্তে বসিয়া হুঁকা টানিতে টানিতে মাঝে মাঝে হাঁক পাড়িতেছিল, আর তাহার সম্মুখে ময়দানে দুইজন প্রহরী পদচারণা করিয়া পাহারা দিতেছিল। প্রহরী রোমজান ভিতরের লৌহ-অর্গল খুলিয়া দ্বারে করাঘাত করায় গোলামআলি খাঁ বাহির হইতে দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দিল, শক্তি বহির্গত হইয়া আসিলেন। পদচারণশীল প্রহরী দুইজন দ্বারোদ্ঘাটন শব্দ শুনিয়া একই সঙ্গে সুধীরে বলিয়া উঠিল, "কোন হ্যায় ?"

জমাদার দ্বার বন্ধ করিতে করিতে উত্তর করিল,

"কুছ ফিকির নেই, আপনা কাম করকে চল, ভাইয়া !"

প্রহরী দুইজন আর কোনও কথা না কহিয়া পুনরায় স্ব স্ব পথচারী হইল। জমাদার দ্বার রুদ্ধ করিয়া দেখিল, আউরং দ্বার-দেশ হইতে কিছু দূরে চলিয়া গিয়াছে। দ্রুতপদে নিকটে অগ্রসর হইয়া বলিল, "আঙ্গুঠি ?

কুতব শক্তিকে গোলামআলি খাঁর নিকটে পঁহুছিয়া রাখিয়া একটি আংটি দিয়া যায়। এই আংটির বলেই তিনি গণেশদেবের প্রকোষ্ঠে অবাধে প্রবেশ লাভ করিতে পারিয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে কথা ছিল, শক্তির অপেক্ষায় কুতব নিকটস্থ প্রহরীখানায় বসিয়া থাকিবে, তিনি কারা-বাহির হইবার পর এই আংটি গোলাম আলি খাঁর মারফং তাহাকে ফেরং পাঠাইলে সে আবার এখানে আসিয়া শক্তিকে সঙ্গে লইয়া নিরাপদে প্রাসাদ পর্য্যন্ত পঁহুছিয়া দিবে। কুতব যে প্রকৃতপক্ষে প্রহরীখানায় বসিয়া বেগমসাহেবের শুভাকাঙ্ক্ষায় মগ্ন ছিল না, তাহা পাঠক জানেন। তবে শক্তির কারানির্গমন সংবাদ পাইবার বন্দোবস্ত করিয়া যাইতে সে ত্রুটি

করে নাই। এই জন্য গোলামআলি খাঁর নিকট সে তাহার এক-জন অনুচরকে রাখিয়া যায়। তাহার অনুজ্ঞা ছিল, আউরৎ কারা বাহির হইয়া আংটি দিলেই ইহার মারফৎ গোলামআলি খাঁ অবিলম্বে তাহা প্রাসাদে পাঠাইবে। অবশ্য সে সময়ের মধ্যে যদি কুতব না ফিরিতে পারে। কুতবের মনে ছিল, সুলতানার কারাগার হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের পূর্ব্বেই সে ফিরিতে পারিবে, তবে কি জানি যদি আসিতে বিলম্বই হয়,—রাজাকে শয়নাগার হইতে তুলিয়া সংবাদ দিতে হইবে, কিছু বিলম্ব হইতেও পারে,—সেইজন্য সকলদিক ভাবিয়া চিন্তিয়াই কুতব এইরূপ বন্দোবস্ত করিয়া গিয়াছিল। আউ-রৎ যে সুলতানা ইহা কুতব গোপন রাখিয়াছিল। প্রহরী অঙ্গুরী চাহিলে শক্তি একবার দাঁড়াইয়া বলিল, "আংটি পাঠাইবার প্রয়ো-জন নাই।"

আসল কথা শক্তির এখন প্রাসাদে যাইবার বা কুতবের সহিত সাক্ষাৎ করিবার ইচ্ছা ছিল না। এই বলিয়া শক্তি আবার চলিতে উদ্যত হইলে প্রহরী গতিরোধ করিয়া বলিল, "লেকেন কুতব সাহেবকা হুকুম আ্যাসা হ্যায়।"

রাণী গম্ভীর অনুজ্ঞার স্বরে বলিলেন, "পথ ছাড়—সুলতানার হুকুম।" প্রহরী সভয়ে বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইল; শক্তি অবাধে চলিয়া গেলেন। অল্পক্ষণের মধ্যে অন্ধকার-নিবিড়তায় তাঁহার ক্ষীণ-ছায়া বিলীন হইয়া পড়িল। প্রহরী তখন স্বস্থানে ফিরিয়া আসিয়া তক্তায় বসিয়া চকমকি ঠুকিয়া বলিল, "হুম্! সুলতানা সাহেব! মাইনে আন্দাজ কিয়াথা গণেশদেবকা আউরৎ! খসমকো ভেট-নেকো আয়া—হামলোগকো বি আলবৎ কুচ ভেট মিল যাগা। খোদা সব খারাবি কর দিয়া, ঝ্যায়সা নসীব! কুতবসাহেব, তেরাকো

সাবাস! সুলতান সুলতানা দোনোকোহী গোলাম বানায়া! আরে ভাইয়া ফতে খাঁ উঠোগে কি নেই?"

ফতে খাঁ প্রভুর আজ্ঞা এবং এই হিমরাত্রি একই সঙ্গে উপেক্ষা করিয়া কম্বল দোসর করিয়া গাছতলায় পড়িয়া দিব্য নাক ডাকাইয়া নিদ্রা দিতেছিল। প্রহরীর ডাকে সে ঘুমের ঘোরে বলিল, "আঙ্গুঠী মিলা?"

প্রহরী বলিল, "নেই, ভাইয়া, মিলনেকো নেহি! সুলতানা চলা গিয়া।"

অনুচর বলিল, "যাতা—যাতা" বলিয়া আবার নীরব হইয়া পড়িল। প্রহরী ভাবিল, ফতে খাঁর হাতে কুতবকে আংটি পাঠাইবার কথা,—সেই আংটিই যখন মিলিল না, তখন তাহাকে জাগাইয়া কুতবের নিকট এ সংবাদ পাঠানর পূর্ব্বে আর এক ছিলাম তামাক নিঃশেষ করিলে হুকুমের অমান্য হইবে না। এই ভাবিয়া সে সম্পূর্ণ কর্ত্তব্যপালনরত নিশ্চিন্তভাবে তামাকু সেবন করিতে লাগিল।

ত্রয়োত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

শক্তি চলিল; অন্ধকারে একাকী চলিল। অন্ধকারে চলিতে সে অনভ্যস্ত নহে, বনদেশও তাহার পরিচিত। বনস্থলীর প্রতি পথ প্রত্যেক বৃক্ষটি পর্য্যন্ত যেন এই অন্ধকারের মধ্যেও তাহাকে ক্রোড় পাতিয়া সাদরে আহ্বান করিতেছিল। শক্তি অতি সহজে বিনা কষ্টে সেই বনপথ লঙ্ঘন করিয়া নদীতীরে আসিয়া উপস্থিত হইল। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে নদীতীরে যে তিন্তিড়িবৃক্ষ অর্দ্ধস্থল অর্দ্ধজল অধিকার করিয়া ভূশায়ী ছিল আজ তাহার গুঁড়িমাত্র অবশিষ্ট। সে দিন যে দুইজন ইহার উপর বসিয়া কথোপকথন করিয়াছিল তাহাদের জীবনেও আজ কি রূপান্তর! শক্তি সেই গুঁড়ির দিকে মুহূর্ত্তকাল চাহিয়া আবার চলিল, এবার বনমধ্য দিয়া চলিল, চলিতে চলিতে একবার থমকিয়া দাঁড়াইল, যে বৃক্ষতলে তাহার বহু যত্নের শুষ্ক ফুলেরমালা পদদলিত করিয়াছিল সেইখানে আসিয়া স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইল; তাহার পর বৃক্ষতল হইতে এক মুষ্টি মৃত্তিকা তুলিয়া আপন মণিময় অঞ্চলে বাঁধিয়া লইয়া আবার গন্তব্য পথে চলিতে আরম্ভ করিল। অল্পক্ষণের মধ্যেই শক্তি সেই পুরাতন কালিকামন্দিরের সমীপবর্ত্তী হইল। পূর্ব্বে এই মন্দিরে অবস্থিতিকালে প্রতি সন্ধ্যায় গৃহাভিমুখী হইবার সময় দূর হইতে দ্বারছিদ্রপথে যেরূপ আলোক দেখিতে পাইত আজও সেইরূপ দেখিল। মানসচক্ষে মন্দিরকক্ষে প্রতিমার সম্মুখে সন্ন্যাসিনীর মূর্ত্তি কল্পনা করিতে করিতে দ্বারদেশে আসিয়া উপস্থিত হইল। দ্বার ভিতর হইতে অর্গলবদ্ধ ছিল না—উঁকি মারিয়া দেখিল যাহা ভাবিয়াছিল তাহাই ঠিক,

প্রজ্জ্বলিত হোমাগ্নির সম্মুখে সন্ন্যাসিনী মুদ্রিতনয়নে আসীনা। শক্তি এমন নিঃশব্দে তাঁহার পশ্চাতে আসিয়া দাঁড়াইল যে সন্ন্যাসিনী তাহা জানিতেও পারিলেন না। তিনি মন্ত্র পড়িতে পড়িতে অগ্নিতে আহুতি প্রদান করিলেন—অগ্নি জ্বলিয়া উঠিল, সবলোত্থিত ক্ষিপ্ত বিক্ষিপ্ত শিখারাশি গৃহছাদ স্পর্শ করিতে লাগিল, শক্তির নয়নে যেন রক্তের ফোয়ারা ছুটিতে লাগিল, তাহা হইতে ছিন্ন মুণ্ডরাশি খসিয়া খসিয়া পড়িতে লাগিল। শক্তি বদ্ধদৃষ্টি হইয়া তাহার দিকে চাহিয়া রহিল, সহসা ফোয়ারার উচ্ছ্বাস স্তম্ভিত হইল, ছিন্ন মুণ্ডরাশি শূন্যে চতুষ্কোণভাবে সজ্জিত শ্রেণীবদ্ধ হইল, তাহার উপর আলোক সিংহাসন প্রত্যক্ষ হইল, সিংহাসনে এ কাহার মূর্ত্তি! শক্তি প্রখর দৃষ্টিতে তাহাকে চিনিবার প্রয়াস করিল। এই সময় সন্ন্যাসিনী আর একবার স্বাহা মন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক কহিলেন,—'হে সর্ব্বশক্তিমতি, ভগবানের ব্যক্তরূপা প্রকৃতি! তুমি প্রসন্ন হও। তোমার করুণায় বিশ্ব সংসারের উৎপত্তি স্থিতি, তোমার ক্রোধে ইহার প্রলয় বিনাশ! তুমি রুদ্রারূপে এ দেশের এই দুর্দ্দশা আনয়ন করিয়াছ, তোমার প্রসন্ন কটাক্ষে ইহার দুঃখ দূর কর। তুমি করুণা করিয়া গণেশদেবকে মুক্তি প্রদান কর—এই অত্যাচারপীড়িত হতভাগ্য দেশে সৌভাগ্যের উদয় হউক!"

শক্তি সন্ন্যাসিনীর আরাধ্য দেবীর প্রতিনিধিস্বরূপে উত্তর করিল, "তথাস্তু! মহাশক্তি আমাকেই সেই কার্য্যে নিয়োজিত করিয়া এখানে প্রেরণ করিয়াছেন।"

সন্ন্যাসিনী চক্ষু উন্মীলিত করিয়া শক্তিকে দেখিয়া বলিলেন, "তুমি শক্তি! সুলতানা! তুমি গণেশদেবকে মুক্তি দিবে?"

শক্তি বলিল, "ইতিপূর্ব্বেই দিতাম, কিন্তু তিনি আমার নিকট হইতে মুক্তি লইতে অস্বীকৃত হইলেন।"

এই বলিয়া ইতিপূর্ব্বের সমস্ত বৃত্তান্ত শক্তি সন্ন্যাসিনীকে জানাইয়া বলিল, "আপনি আমার সঙ্গে আসুন; এই অঙ্গুরী দেখাইয়া আমরা এখনো কারাপ্রবেশ করিতে পারিব। তাহার পর তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া আপনি পলায়ন করিতে পারিবেন।"

সন্ন্যাসিনী উঠিয়া দাঁড়াইলেন। শক্তি বলিল, "একটু অপেক্ষা করুন, আমাকে এ বস্ত্র ছাড়িতে হইবে—অন্য কাপড় একখানি দিতে পারেন?"

সন্ন্যাসিনী এক খানি গেরুয়া বস্ত্র মন্দির কোণ হইতে লইয়া বলিলেন, "ইহাতে চলিবে?"

শক্তি সেই গেরুয়া পরিধান করিয়া বস্ত্রাঞ্চলের ধূলিরাশি অঙ্গে মাখিয়া তাহার পর শালের জোড়া একখান খুলিয়া মাথার উপর দিয়া গাত্রে জড়াইল, এবং তাহার পরিত্যক্ত মণিময় বস্ত্র দুই খণ্ড ও বাকি একখান শাল সন্ন্যাসিনীকে দিয়া বলিল, "ইহার একখানা পরুন, একখানা গায়ে জড়াইয়া নিন, আর শালখানা মাথায় দিন। তারপর কারাগৃহে গিয়া গায়ের খানা গণেশদেবকে পরাইবেন, আর আমার এই শাল খুলিয়া দিব, তাঁহার মুখের বেশ আবরণ হইবে। এইরূপে আপনারা দু-জনে পলাইতে পারিবেন, প্রহরীরা ভাবিবে যে দুজন ঢুকিয়াছিল তাহারাই ফিরিতেছে!"

সন্ন্যাসিনী বলিলেন, "আর তুমি?"

শক্তি। গণেশদেবের পরিবর্ত্তে আমি কারাগারে থাকিব। আমার জন্ত ভাবনা নাই, কুতব আমার সহায় আছে।

সন্ন্যাসিনী তাহার বিপদ বুঝিলেন; কিন্তু তাহাকে এ সঙ্কল্প

হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিতে প্রয়াস পাইলেন না। গণেশদেবকে উদ্ধার করিতে, দেশের হিতসাধন করিতে শক্তির যদি মৃত্যু হয় সে মৃত্যুও সুখের। শক্তির সেই পরম সুখ অনুভব করিয়া সন্ন্যাসিনীও সুখে দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিলেন।

শক্তি বলিল, "দেবি, আর একটি কাজ আছে, আমার মাথার চুলগুলি কাটিয়া দিন।" শক্তি কালীর খড়্গ একখানি খুলিয়া সন্ন্যাসিনীর হাতে দিল। সুললিত সুদীর্ঘ ঘন কেশদাম সেই খড়্গে কাটিয়া সন্ন্যাসিনী তাহার হাতে দিলেন। শক্তি সেইগুলি একবার হাতে লইয়া আবার তাঁহার হাতে দিয়া বলিল, "গুলবাহার যদি মাতৃহীনা হয় ত তাহাকে এই গুলি দিবেন, আর মনে রাখিবেন এখন হইতে সে আপনারই কন্যা।"

সন্ন্যাসিনী নীরবে সেই চুলগুলি কালীর পদতলে চাপা দিয়া মন্দির হইতে নির্গত হইলেন। শক্তি পূর্ব্বেই মন্দিরনির্গত হইয়া বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল।

চতুঃত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

সন্ন্যাসিনী ডাকিলেন, "রাজকুমার!" নিদ্রিত গণেশদেব চমকিয়া জাগিয়া উঠিয়া বলিলেন, "না, শক্তি, আমি যাইব না, আমাকে আর প্রলোভিত করিও না।"

সন্ন্যাসিনী বলিলেন, "বৎস, আমি শক্তি নহি। তুমি উঠ, তোমাকে মুক্ত করিতে আসিয়াছি।"

গণেশদেব সন্ন্যাসিনীর স্বর চিনিতে পারিলেন, হৃৎপিণ্ডে রক্তধারা শতোচ্ছ্বাসে উথলিয়া উঠিল। সত্যই তবে এবার তিনি স্বাধীনতা লাভ করিলেন! পুলকে বিস্ময়ে ত্রস্তে উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন, "ভগবতী সন্ন্যাসিনী এখানে?"

সন্ন্যাসিনী বলিলেন, "হাঁ শীঘ্র প্রস্তুত হইয়া লও, এই বস্ত্রে স্ত্রীবেশ ধারণ করিয়া এই শালখানিতে চক্ষু ব্যতীত সমস্ত মুখ ঢাকিয়া আমার অনুবর্ত্তী হও।" গণেশদেব যথাশীঘ্র বেশ সমাধা করিয়া বলিলেন "দেবি, আমি প্রস্তুত।" সন্ন্যাসিনী তখন সুধীরে দ্বারে করাঘাত করিলেন, দ্বার উন্মুক্ত হইলে তাঁহারা বাহির হইয়া গেলেন। মুহূর্ত্তে লৌহকবাট এবং শক্তি একই সঙ্গে আবার রুদ্ধ হইল।

শক্তি কারাগৃহে প্রবেশ করিয়া এতক্ষণ গৃহের এক কোণে কম্পিত হৃদয়ে চুপ করিয়া বসিয়াছিল। তাহার ভয় হইতেছিল পাছে গণেশদেব তাহাকে দেখিতে পাইয়া পলায়নে আবার কোন আপত্তি করেন। যদিও তাহার এ উদ্বেগ নিতান্ত অমূলক, কেননা তাঁহারা গৃহ-প্রবেশকালে গণেশদেব দেখেন নাই, তিনি তখন নিদ্রিত

ছিলেন; তাহার পর জাগ্রত হইয়াই তিনি পলায়নতৎপর, উদ্বিগ্নচিত্ত, অন্য কোন দিকে লক্ষ্য দিবার অবসরই নাই, ইহার উপর আবার গৃহ অন্ধকার, সহজে কিছু নজরেই পড়ে না। সুতরাং শক্তির ভয়, উদ্বেগ ব্যর্থ করিয়া দিয়া তিনি সন্ন্যাসিনীর সহিত চলিয়া গেলেন, শক্তি রুদ্ধ নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল। এতদিনে তাহার একটি বাসনা পূর্ণ হইল। একটি বাসনা, কিন্তু আজীবনের আবেগ কেন্দ্রীভূত শেষ বাসনা! ইহার সিদ্ধিতে সে পরম সিদ্ধি লাভ করিল, ইহার সফলতায় তাহার চির-নৈরাশ্যকষ্ট মুহূর্তে অসীম আনন্দ সমুদ্রে যেন বিলুপ্ত হইয়া পড়িল। শক্তি তখন গৃহকোণ ছাড়িয়া গণেশদেবের পরিত্যক্ত স্থানে আসিয়া শয়ন করিল। এই কঠোর ভূমিশয্যায় শয়ন করিয়া সে যে অতুল সুখ অনুভব করিল, কোমল রাজশয্যায় তাহার অদৃষ্টে কখনও সে সুখ ঘটে নাই। আনন্দ-উথলিত কৃতজ্ঞতা-পূর্ণ হৃদয়ে সে ঈশ্বরাহ্বান করিয়া কহিল, "হে করুণাময়, ভক্তবৎসল, এতদিন তোমার অকারণ নিন্দা করিয়াছি—সে জন্য আমাকে ক্ষমা কর। তুমি এতদিন আমায় যে দুঃখ কষ্ট দিয়াছ—তাহা এই আনন্দ-সমুদ্রে বারিকণামাত্র, এই সমুদ্র সৃজনের জন্যই তাহা সঞ্চিত হইতেছিল। আমি অতি মূঢ়, অবোধ অজ্ঞান, কেমন করিয়া বুঝিব সেই বিন্দুরূপী দুঃখ কষ্টের পরিণাম-উদ্দেশ্য এই মহানন্দ, পরম সুখ! ভগবান, যদি এই দীনহীনা অযোগ্যাকে এত করুণা, এত সুখদান করিলে, তাহার আর একটি প্রার্থনাও পূর্ণ কর। প্রভু, এ সুখ হইতে তাহাকে আর বিচ্ছিন্ন করিও না, এই আনন্দের মধ্যে যেন তাহার এ জীবনেরও শেষ হয়।"

গণেশদেব চলিয়া যাইবার সময় তাঁহার একমাত্র দখলী-সম্পত্তি একখানি ছিন্ন কম্বল এখানে ফেলিয়া গিয়াছিলেন। শক্তি তাহাতে

আপাদমস্তক আবরিত করিয়া এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে তন্দ্রানুভব করিল।—তন্দ্রাযোগে তাহার কর্ণে দূর বাঁশরী সঙ্গীত বাজিয়া উঠিল। বাঁশরী গাহিতে লাগিল,—

আমি কি চাহি!
সে আমার আমি তার, আমার কি নাহি!
আনন্দ-সাগর খেলে পদতলে,
কোটি চন্দ্র তারা শিরোপরি জ্বলে,
বিশ্ব ভুবনের রূপ-রত্ন-মণি
তাহাতে বিরাজে, সে মোর তরণী,
আমি তাহারে বাহি!—আর কি চাহি!
সে আমার অমি তার, আমার কি নাহি!

দূরে থেকে দেখে ভাবে লোকে সবে,
দীনহীন নেয়ে আমি এই ভবে।
তরী বাহি আর হাসি মনে মনে,
তাহারা এ সুখ বুঝিবে কেমনে!
জগতে সবাই দুখের প্রবাসী,
আমি শুধু সুখে দিবানিশি ভাসি!
কালাকাল হেথা নাহি!—আমি কি চাহি!
সে আমার আমি তার, আমার কি নাহি!

আমার মতন ধনী কেহ নাই,
অনন্ত উল্লাস বাঁধা মোর ঠাঁই।
রূপের তরণী প্রেমেতে চালাই,
আনন্দ সঙ্গীত গাহি!—আর কি চাহি!
সে আমার আমি তার, আমার কি নাহি!

শক্তির বাল্যকাল ফিরিয়া আসিল। স্বপ্নে রাজকুমার শক্তির কণ্ঠে ফুলমালা পরাইয়া তাহাকে লইয়া তরণীতে উঠিলেন, শক্তি দাঁড় বাহিতে লাগিল। রাজকুমার বাঁশি বাজাইয়া গাহিতে লাগিলেন,—

আমি কি চাহি!
আমি তার সে আমার, আমার কি নাহি!—

সকলই সে দিনের মত। সুন্দর জ্যোৎস্না, ফুলের গন্ধ, দক্ষিণা বাতাস, কোকিল পাপিয়ার মধুর সঙ্গীত, আর তাহার মধ্যে রাজকুমারের সেই বাঁশরীর প্রাণমনহারী আনন্দ তান। সবই সেই। কেবল সে দিনের মত অন্য বালিকারা নাই, নিরূপমার সেই করুণ মুখস্মৃতি উভয়ের মাঝখানে উত্থিত হইয়া তাহাদের পরিপূর্ণ আনন্দোচ্ছ্বাসের ব্যাঘাত জন্মাইতেছে না। এই আনন্দ রজনীতে তাহারা কেবল দুইটি প্রাণী এক আত্মা হইয়া সঙ্গীতের সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীর বন্ধন, দেহের বন্ধন মুক্ত হইয়া অসীম আনন্দ-রাজ্যে ভাসিয়া চলিয়াছে!

ক্রমে শক্তির দ্বিত্ব জ্ঞান পর্য্যন্ত লোপ পাইল, তাহাদের দুই

আত্মা এক হইয়া বিশ্বের সমগ্র আত্মায় বিলীন হইয়া পড়িল, ক্ষুদ্র প্রেম মহান প্রেমে মগ্ন হইয়া গেল, এক আনন্দময় মহাচৈতন্যের মধ্যে শক্তি গভীর নিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়িল।

* * * * * * * *

* * * * * * * *

একজন অতি মৃদুকণ্ঠে কহিল, "বন্দী গভীর নিদ্রিত।"

অন্য জন কহিল, "ভালই সহজে কার্য্য সমাধা হইবে।"

উভয়ের মৃদুকণ্ঠ কথোপকথনে রুদ্ধগৃহ কম্পিত শিহরিত হইয়া উঠিল—কিন্তু তাহাতে বন্দীর সুখ নিদ্রার কিছুমাত্র ব্যাঘাৎ ঘটিল না। প্রথম ব্যক্তি কহিল, "আপনি আলোক লইয়া দ্বারের বাহিরে দাঁড়ান, তাহার পর আমি বন্দীর মুখাবরণ খুলিয়া অন্ধকারে কাজ শেষ করিব, আলোকে বন্দীর ঘুম ভাঙ্গিয়া যাইতে পারে"।

কুতব বাহিরে আসিয়া মশাল ভূমে নিক্ষেপ করিয়া সবে মাত্র স্থির হইয়া দাঁড়াইয়াছে, প্রায় তৎক্ষণাৎ সুলতান গায়সুদ্দিন দ্রুতপদে উন্মত্তের ন্যায় কারাদ্বারে আসিয়া দেখা দিলেন। তিনি কুতবকে বিদায় করিয়া কম্পিত উৎকণ্ঠায় তাহার অপেক্ষা করিতেছিলেন। কিন্তু অধিকক্ষণ এ উৎকণ্ঠা তিনি স্থিরভাবে সহ্য করিতে পারিলেন না। সুলতানের পদমর্য্যাদা মান অপমান জলাঞ্জলি দিয়া নিজে কারাদ্বারে আগমন করিলেন, দ্বারে কুতবকে দেখিয়া কহিলেন, "কুতব, আজ্ঞা পালিত হইয়াছে? গণেশদেবের মুণ্ড কই? সুলতানা কোথায়?"

হত্যাকারী এই সময় বস্ত্রমণ্ডিত কোন দ্রব্য আনিয়া নীরবে

কুতবের হস্তে প্রদান করিল। কুতব তাহা বস্ত্রশূন্য করিয়া মহা-রাজকে দেখাইয়া বলিল, "জাঁহাপনা! এই লউন নরাধম গণেশ-দেবের মুণ্ড।"

ভূমি-নিক্ষিপ্ত মশাল তখনও নিভে নাই, তাহার আলোকরশ্মি মৃতমুখ উদ্দীপ্ত করিল।

সুলতান কহিলেন, "এ কাহার মুণ্ড! মশাল উঠাইয়া ধর!"

প্রহরী মশাল উঠাইয়া ধরিল।

"সয়তান! এ কি করিয়াছিস!" বলিয়া সুলতান ক্ষিপ্তের ন্যায় চীৎকার করিয়া উঠিলেন।

উপসংহার

শক্তিকে নিহত দেখিয়া গায়সুদ্দিন উন্মত্তের ন্যায় কার্য্য করিতে লাগিলেন। কুতবের প্রাণদণ্ড হইল, সাহেবুদ্দিনের প্রাণদণ্ড হইল, কারাগৃহের প্রহরীদিগের প্রাণদণ্ড হইল, অপরাধী নিরপরাধীভেদে কেবল তিনি প্রাণদণ্ডের হুকুম দিতে লাগিলেন। সভাসদগণ ভয়ে ত্রস্ত হইয়া উঠিল, প্রজাগণের হৃৎকম্প উপস্থিত হইল, কোন ছুতায় না জানি কখন তাহাদের মধ্যে কাহার ফাঁসি যাইতে হয়। তাহারা অনেকেই গোপনে, কেহ কেহ বা প্রকাশ্যে গণেশদেবের পক্ষাবলম্বন করিল। গণেশদেবের সহিত সুলতানের যুদ্ধ বাধিল। সুলতান পরাজিত, নিহত হইলেন। মুসলমান হিন্দু সকলে মিলিয়া গণেশদেবকে বঙ্গরাজ্যে অভিষিক্ত করিল, বঙ্গের ভাগ্যে সহসা এক অভূতপূর্ব্ব ঘটনা ঘটিল—যবনসিংহাসনে হিন্দু রাজা অধিষ্ঠিত হইলেন।

শক্তির সহিত নিরুপমার অদৃষ্টের অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ। শক্তির ধনে নিরুপমা চির দিন ধনী। শক্তির মৃত্যুতেও ভবিতব্য এখানে স্থির নিশ্চল, অকাট্য, অপরিবর্ত্তনীয়। শক্তির রাজ্যে শক্তি আর নাই, নিরুপমা এখন বঙ্গেশ্বরী। শক্তির উদ্যানে সেই ফুলের শোভা, সেই রমণীয় সজ্জা, কেবল শক্তির পরিবর্ত্তে তাহার অধিনায়িকা এখন নিরুপমা। রাজরাণী নিরুপমা গণেশদেবের সহিত উদ্যানে বসিয়া প্রদোষ সৌন্দর্য্য দেখিতেছিলেন। রাজকুমার যাদবদেব এই সময় একটি রোরুদ্যমানা বালিকার হস্ত ধরিয়া নিকটে আসিয়া বলিল, "মা, মা! সাহাজাদীকে আমি বিয়ে করব।" এই বলিয়া

বালিকার দিকে ফিরিয়া তাহাকে সাদরে কহিল, "কেঁদনা। তুমি আমার রাণী—তোমার জন্তে আমি ফুল নিয়ে আসি।"

নিরুপমা পুত্রের ব্যবহারে ব্যথিত হইয়া ঘৃণার স্বরে বলিলেন "ছি ছি যাদব! ও যে মুসলমানী—ওকে ছেড়ে দাও—"

তাহাদিগের সঙ্গে সঙ্গে সন্ন্যাসিনীও তথায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। তিনিই বালিকাকে লইয়া গণেশদেবের নিকট আসিতেছিলেন,পথিমধ্যে রাজপুত্র বালিকাকে লুট করিয়া লয়। নিরুপমার কথায় সন্ন্যাসিনী কহিলেন,"বৎসে, বিজাতীয় বলিয়া উহাকে ঘৃণা করিও না। উহার মাতা তোমাদের সকলের জন্ম প্রাণ দিয়াছে—তাহা মনে রাখিও।"

গণেশদেব দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া গুলবাহারকে কোলে তুলিয়া তাহার মুখ-চুম্বন করিলেন, নিরুপমা ভীত দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া রহিলেন। বালক যাদব ইতিমধ্যে ছুটিয়া সুন্দরলালের নিকট হইতে একগাছি ফুলের মালা সংগ্রহ করিয়া আনিয়া বালিকাকে পরাইয়া কহিল, "সাহাজাদি, তুমি আমার রাণী, তোমাকে আমি বিয়ে করব।"

নিরুপমার ভয় সত্য হইল, বালক যাদবের বাল্য কথা সত্য হইল, শক্তির অভিশাপ ফলিল। বালক যাদব যৌবনে মুসলমান হইয়া এই বালিকার পাণিগ্রহণ করিলেন। এই যাদবদেবই ভবিষ্যতে বঙ্গরাজ জেলালুদ্দিন নামে খ্যাত।